মাসিক
আত-তাহরীক

১৪তম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২
✡ **প্রবন্ধ :**
* পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(২৫/৭ কিস্তি)* ০৩
- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
* ইসলামে ভ্রাতৃত্ব *(শেষ কিস্তি)* ১৫
- ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ
* জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত *- মুযাফফর বিন মুহসিন* ২২
* আল্লাহ সর্বশক্তিমান ২৮
- রফীক আহমাদ
✡ **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ৩৩
♦ গ্লোবাল টাইগার সামিট
♦ হাইকোর্টের রায় এবং পার্বত্যচুক্তির ভবিষ্যৎ
✡ **ক্ষেত-খামার :** ৩৬
♦ ডাল পুঁতে পোকা নিধন
♦ সফল চাষী
♦ ১৫ লাখ হেক্টর জমির ধানে আর্সেনিক
✡ **কবিতা :** ৩৭
♦ ভোর বিহানে ♦ ঐক্য গড়ার ফরমুলা
♦ ২১শে ফেব্রুয়ারী না ৮ই ফাল্গুন?
✡ **মহিলাদের পাতা** ৩৮
♦ বিশ্ব ভালবাসা দিবস
-নূরজাহান বিনতে আব্দুল মজীদ (রুকু)
✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪৩
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৪
✡ **মুসলিম জাহান** ৪৬
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৬
✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৭
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৫০

সম্পাদকীয়

নির্বাচনী যুদ্ধ :

বিগত সংসদ নির্বাচনের পর এখন আসছে পৌরসভা নির্বাচন। এরপর আসবে ইউপি নির্বাচন। উদ্দেশ্য, দেশের সর্বত্র সুশাসন কায়েম করা। দলমত নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জীবনে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দেওয়া। সমাজে ন্যায়নীতি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়া। জনগণের নির্বাচিত ব্যক্তিই জনগণকে অধিক জানেন, অতএব তিনিই জনগণের সত্যিকার বন্ধু- এরূপ একটা সুধারণা থেকেই বর্তমান যুগে নির্বাচনী রাজনীতির পদযাত্রা শুরু হয়েছে। আর এজন্য সৃষ্টি হয়েছে দল ও প্রার্থীভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন প্রথা। সবাই ভোট চাইবে। ভোটার যাকে খুশী ভোট দিবে। কিন্তু প্রশ্ন: কোন জ্ঞানী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক কি নেতৃত্ব চেয়ে নিতে বাড়ী বাড়ী ঘুরতে চান? তাছাড়া অজ্ঞ ও বিজ্ঞের ভোটের মূল্য কি সমান? সমাজের অধিকাংশ সাধারণ লোকের ভোটে বিজ্ঞ লোক কিভাবে নির্বাচিত হবেন? এ জন্য জ্ঞানী ও যোগ্য লোকদের সুবিধাবাদী নীতি ও প্রতারণামূলক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। অথবা সরে দাঁড়াতে হবে। আজকে সেটাই হয়েছে। জ্ঞানীরা এসব থেকে দূরে থাকেন। ফলে অধিকাংশ জনপ্রতিনিধিই এখন সমাজে অসম্মানিত শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন। ১০০ ভোটারের মধ্যে ১০ জন প্রার্থীর ৯ জনের প্রাপ্ত ভোট যদি ৮৯ হয়। অন্যের ১০টি ভোটের চাইতে একজনের প্রাপ্ত ভোট যদি ১১টি হয়, তাহ'লে তিনিই হবেন ১০০ জনের নির্বাচিত প্রতিনিধি। যদিও তিনি হলেন মূলত: ১১ জনের প্রতিনিধি। এই শুভংকরের ফাঁকি ছাড়াও রয়েছে বিরাট জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি ও সময়ের অপচয়। রয়েছে ভয় প্রদর্শন, মিথ্যা আশ্বাস ও ধোঁকা-প্রতারণার গরমবাজারী। কেননা প্রত্যেক প্রার্থীই ১০০ ভোটারের মন জয় করার জন্য দু'হাতে পয়সা খরচ করে। অবশেষে ৯ জন ফেল করলে তারা সব হারায়। এই ভোটের জুয়ায় যে পাশ করে, তার প্রধান লক্ষ্য হয়- ব্যয়কৃত অর্থ সূদে-আসলে উঠিয়ে নেওয়া এবং আগামী ভোট আসার আগেই সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা। এমনকি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া। এই নির্বাচনী যুদ্ধের আবশ্যিক পরিণতি হিসাবে সমাজের সর্বত্র সশস্ত্র ক্যাডারের একটি দল সৃষ্টি হয়েছে। যারা প্রার্থীর টাকা পেয়ে মিছিল-মিটিং করে, প্রতিপক্ষের ক্ষতি করে, এমনকি খুনোখুনিতেও লিপ্ত হয়। অথচ যে উদ্দেশ্যে এরা নির্বাচিত হন, তার কিছুই এদের দ্বারা সমাজ পায় না। ফলে সাম্প্রতিক জরিপে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বের অধিকাংশ দুর্নীতির উৎস হ'ল রাজনীতিবিদরা অর্থাৎ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। যদিও নিঃস্বার্থ ও জনদরদী রাজনীতিবিদগণের সম্মান ও মর্যাদা সর্বদা ছিল ও থাকবে। কিন্তু বিশেষ করে স্থানীয়

সরকারের জনপ্রতিনিধিরা রাজনীতিবিদ নন। তাদেরকে আনা হয় প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য। সমাজে শান্তি ও শৃংখলা নিশ্চিত করার জন্য। কিন্তু বাস্তবে হয়ে থাকে তার উল্টা। আধুনিক প্রযুক্তি ছাড়াই দিল্লীতে বসে বাংলা পর্যন্ত বিশাল ভারতবর্ষের ১ লাখ ১৩ হাযার পরগণা শাসন করেছেন শেরশাহ (১৫৪০-৪৫ খৃঃ)। শায়েস্তা খাঁর আমলে (১৬৬৪-৮৮ খৃঃ) টাকায় ৮ মণ চাউল কিনেছে ঢাকার মানুষ। অথচ এদেশের মানুষ এখন পেটের দায়ে সন্তান বিক্রি করছে। নেতৃত্ব নিয়ে ঘরে ঘরে এরূপ মারামারি-কাটাকাটি তখন ছিল না। কিন্তু এখন সর্বত্র নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও ছোট্ট একটি দেশ শাসন করতেও আমরা অপারগ। কারণ কী? এর গোড়ায় গলদ কোথায়? জবাব এই যে, এর প্রধান গলদ হচ্ছে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়ার রাজনীতি। যা তার মধ্যে নেতৃত্ব আদায় করে নেওয়ার হিংস্র মানসিকতা সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন হ'ল: এরূপ নির্বাচনের আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি? রাষ্টের প্রধান তিনটি বিভাগ হ'ল বিচার, শাসন ও আইন বিভাগ। বিচার ও শাসন বিভাগে কোন নির্বাচন হয়না। জজ-ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং ডিসি, ইউএনও গণ হন সরকারের নিযুক্ত। বাকী আইনসভা বা জাতীয় সংসদ সদস্যগণ হন জনগণের নির্বাচিত। অন্যদের যোগ্যতা বিচার করা আবশ্যিক হ'লেও যারা আইনপ্রণেতা হবেন, তাদের কোন সততা-যোগ্যতা-দক্ষতা কিছুই বিচার করা হয় না। তাই দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হন কোনরূপ ডিগ্রীহীন স্বশিক্ষিত দলনেতা। আর এইসব নেতারা যখন শিক্ষা বিভাগ এবং শাসন ও বিচার বিভাগের উপর খবরদারী করেন, তখন দেশের অবস্থা যেমনটা হওয়া উচিত, তেমনটাই হচ্ছে। মানীর মান নেই, গুণীর কদর নেই। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, গুম, খুন, নারী নির্যাতন এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। পৃথিবীর যেসব দেশে এই নির্বাচনী জুয়া রয়েছে, সেসব দেশ এভাবে অশান্তির দাবানলে জ্বলছে মূলত: এই দল ও প্রার্থীভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থার কারণে। এতে সৎ ও যোগ্য লোক নির্বাচিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। কেউ হ'লেও নিজ দলীয় বা বিরোধী দলীয় চাপে তিনি সৎ ও নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না।

অথচ ডিসি ও ইউএনও-দের সাথে অতিরিক্ত প্রশাসক দু'তিনজনকে নিয়োগ দিয়ে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। অতিরিক্ত যেলা প্রশাসক ও উপযেলা প্রশাসকদের কাজ হবে দৈনিক গ্রামে-গঞ্জে সফর করা ও জনগণের সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়া ও তাদের কথা শোনা। যার যত সুনাম হবে, তার তত দ্রুত পদোন্নতি হবে ও তিনি পুরস্কৃত হবেন। দুর্নাম হলে শাস্তি হবে। যেলা প্রশাসকের ন্যায় প্রয়োজনে ইউনিয়ন প্রশাসকও নিয়োগ করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রের প্রধান ২টি স্তম্ভের ন্যায় আইন প্রণয়ন বিভাগটিও হবে সরকারের মনোনীত। দেশের যিনি প্রধান হবেন একমাত্র তিনিই হবেন নির্বাচিত। এবং তা হবে রাষ্ট্রের জ্ঞানী-গুণীদের মাধ্যমে দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন নীতির অনুসরণে। সাধারণ জনগণ উপরোক্ত নির্বাচনকে সমর্থন করবে মাত্র। এই প্রযুক্তির যুগে সকলে ঘরে বসে অন-লাইনে ভোট দিবে। কোন ক্যানভাস, হৈ-হুল্লোড় ও টাকার ছড়াছড়ি থাকবে না। নির্বাচন কমিশন দায়িত্বশীল হবেন কিভাবে তাঁরা দল ও প্রার্থীবিহীন নির্বাচন পরিচালনা করবেন। নির্বাচিত নেতা জানতে বা বুঝতেও পারবেন না কারা তাকে ভোট দিয়েছে বা দেয়নি। এর ফলে তার মানসিকতা থাকবে সবার প্রতি উদার ও নিরাসক্ত। দলীয় চাপ থেকে তিনি মুক্ত থাকবেন ও নিরপেক্ষভাবে দেশ শাসন করতে পারবেন। সরকারী ও বিরোধীদলের কোন নামগন্ধ থাকবেনা। অতঃপর তিনি দেশের সর্বোচ্চ জ্ঞানী-গুণী ও বিশ্বস্ত এবং যোগ্য ও অভিজ্ঞ সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পার্লামেন্ট মনোনয়ন দিবেন। যাদের পরামর্শে তিনি দেশ শাসন করবেন। যদি তিনি বা দেশের অধিকাংশ নাগরিক আল্লাহতে বিশ্বাসী হন, তাহ'লে তিনি আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে মেনে নিবেন এবং আল্লাহ্র বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করবেন। কোনভাবেই তিনি বা তার পার্লামেন্ট স্বেচ্ছাচারী হবেন না। ইনশাআল্লাহ এভাবেই দেশে শান্তি ফিরে আসবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কারণ যদি চাওয়ার মাধ্যমে তোমাকে তা দেওয়া হয়, তাহ'লে তুমি তাতেই পতিত হবে। আর যদি না চাইতে দেওয়া হয়, তাহ'লে তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে' *(বুঃমুঃ, মিশকাত হা/৩৬৮০)*। তিনি বলেন, 'আল্লাহ্র কসম! আমরা ঐ ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিনা, যে ব্যক্তি তা চেয়ে নেয় বা লোভ করে বা মনে আকাংখা পোষণ করে' *(বুঃ মুঃ, মিশকাত হা/৩৬৮৩)*। তিনি আরও বলেন, 'দুনিয়ায় যে ব্যক্তি নেতৃত্বের লোভ করে, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য তা লজ্জার কারণ হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৮১)*।

অতএব, ঘরে ঘরে নেতা হবার এই অন্যায় প্রতিযোগিতা ও দলাদলি-হানাহানির মূল উৎস বন্ধ করতে হবে। সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে তাই আমাদের পরামর্শ হ'ল: দল ও প্রার্থীবিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে চালু করুন। সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিপতিদের প্রতারণামূলক এই নির্বাচন ব্যবস্থার লেজুড়বৃত্তি পরিহার করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!! *(স.স.)*।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৫/৭ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ

(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

ছাহাবীগণের ইয়াছরিবে কষ্টকর হিজরত শুরু :

বায়'আতে কুবরা সম্পন্ন হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্যাতিত মুসলমানদের ইয়াছরিবে হিজরতের অনুমতি দিলেন। এই হিজরত অর্থ স্রেফ দ্বীন ও প্রাণ রক্ষার্থে সর্বস্ব ছেড়ে দেশত্যাগ করা। কিন্তু এই হিজরত মোটেই সহজ ছিল না। মুশরিক নেতারা উক্ত হিজরতে চরম বাধা হয়ে দাঁড়ালো। ইতিপূর্বে তারা হাবশায় হিজরতে বাধা দিয়েছিল। এখন তারা ইয়াছরিবে হিজরতে বাধা দিতে থাকল। ইসলামের প্রসার বৃদ্ধিতে বাধা দেওয়া ছাড়াও এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক। অর্থনৈতিক কারণ ছিল এই যে, মক্কা থেকে ইয়াছরিব হয়ে সিরিয়ায় তাদের গ্রীষ্মকালীন ব্যবসা পরিচালিত হ'ত। এ সময় সিরিয়ায় তাদের বার্ষিক ব্যবসার আর্থিক মূল্য ছিল প্রায় আড়াই লক্ষ দীনার। এছাড়াও ছিল ত্বায়েফ-এর ব্যবসা। উভয় ব্যবসার জন্য যাতায়াতের পথ ছিল ইয়াছরিব। আল্লাহ পাক এমন এক স্থানে নির্যাতিত মুসলমানদের হিজরতের ব্যবস্থা করেন, যা হয়ে ওঠে এক অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ভূমি।

দ্বিতীয়তঃ এই হিজরতের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল এই যে, ইয়াছরিবে মুহাজিরগণের অবস্থান সুদৃঢ় হ'লে এবং ইয়াছরিববাসীগণ ইসলামের পক্ষে অবস্থান নিলে তা মক্কার মুশরিকদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিবে। ফলে তা মক্কাবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। যাতে তাদের জান-মাল ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু হুমকির মধ্যে পড়বে। এসব দিক বিবেচনা করে তারা হিজরত বন্ধ করার চেষ্টা করতে থাকে এবং সম্ভাব্য হিজরতকারী নারী-পুরুষের উপরে যুলুম ও অত্যাচার শুরু করে দেয়। যাতে তারা ভীত হয় ও হিজরতের সংকল্প ত্যাগ করে। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হ'ল:

(১) ছুহায়েব রূমী (রাঃ) হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লেন। কিছু দূর যেতেই মুশরিকরা তাকে রাস্তায় ঘিরে ফেলে। তিনি সওয়ারী থেকে নেমে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, দেখ তোমরা জানো যে, আমার তীর সাধারণতঃ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। অতএব আমার তূণীরে একটা তীর বাকী থাকতেও তোমরা আমার কাছে ভিড়তে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলে তলোয়ার চালাব। অতএব তোমরা যদি দুনিয়াবী স্বার্থ চাও, তবে মক্কায় রক্ষিত আমার বিপুল ধন-সম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা সেগুলি নিয়ে নাও এবং আমার পথ ছাড়। তখন তারা পথ ছেড়ে দিল। মদীনায় পৌঁছে এই ঘটনা বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে প্রশংসা করে বলেন, ربح البيع ابا يحيى 'হে আবু ইয়াহইয়া! তোমার ব্যবসা লাভ জনক হয়েছে'। ছুহায়েব-এর এই আত্মত্যাগের প্রশংসা করে সূরা বাক্বারাহ্র ২০৭ আয়াতটি নাযিল হয়। وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُوْفٌ بِالْعِبَادِ 'লোকদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবন বাজি রাখে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতীব স্নেহশীল'।[১] ছুহায়েব রূমী ৩৮ হিজরীতে ৭৩ বছর বয়সে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।

(২) আবু সালামাহ (রাঃ) যিনি ইতিপূর্বে মুসলমান হয়ে সস্ত্রীক হাবশায় হিজরত করেছিলেন। তারপর সেখান থেকে ফিরে এসে বায়'আতে কুবরার বছর খানেক পূর্বে কোলের পুত্র সন্তানসহ স্ত্রী উম্মে সালামাকে নিয়ে হিজরত করেন। কিন্তু মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার পর পথিমধ্যে আবু সালামার গোত্রের লোকেরা এসে তাদের বংশধর দাবী করে শিশু পুত্র সালামাকে ছিনিয়ে নেয়। অতঃপর উম্মে সালামার পিতৃপক্ষের লোকেরা এসে তাদের মেয়েকে জোর করে তাদের বাড়ী নিয়ে যায়। ফলে আবু সালামা স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে একাকী ইয়াছরিবে হিজরত করেন। এদিকে বিচ্ছেদকাতর উম্মে সালামা প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্বামী ও সন্তান হারানোর সেই স্থানটিতে এসে কান্নাকাটি করতে থাকেন ও আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতে থাকেন। এভাবে প্রায় একটি বছর অতিবাহিত হয়। অবশেষে তার পরিবারের জনৈক ব্যক্তির মধ্যে দয়ার উদ্রেক হয়। তিনি সবাইকে বলে রাযী করিয়ে তাকে সন্তানসহ মদীনায় চলে যাওয়ার অনুমতি আদায় করেন। অনুমতি পাওয়ায় সাথে সাথে তিনি একাকী মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কার অদূরে 'তানঈম' নামক স্থানে পৌঁছলে কা'বাগৃহের চাবি রক্ষক উছমান বিন ত্বালহা বিন আবী তালহা তার এই নিঃসঙ্গ যাত্রা দেখে ব্যথিত হন এবং তিনি স্বেচ্ছায় তার সঙ্গী হ'লেন। তাঁকে তার সন্তানসহ উটে সওয়ার করিয়ে নিজে পায়ে হেঁটে প্রায় পাঁচশত কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে যখন মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছলেন,

১. *সৈয়ূতী, আসবাবুল নুযূল; হাকেম ৩/৪৪৮, হা/৫৭৬৮; হাকেম ছহীহ বলেছেন, যাহাবী চুপ থেকেছেন।*

তখন তাঁকে একাকী ছেড়ে দিয়ে পুনরায় মক্কার পথে প্রত্যাবর্তন করলেন।

উম্মে সালামা ও তাঁর স্বামী আবু সালামা প্রথম দিকের মুসলমান ছিলেন। একটি বর্ণনা মতে আবু সালামা ছিলেন একাদশতম মুসলমান। তাদের স্বামী-স্ত্রীর আক্বীদা ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। তদুপরি আবু সালামা ছিলেন রাসূলের দুধভাই। তিনি বদরের যুদ্ধে শরীক হন এবং ওহোদের যুদ্ধে আহত হয়ে পরে মৃত্যু বরণ করেন। তখন দুই ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে উম্মে সালামা দারুণ কষ্টে নিপতিত হন। ফলে দয়া পরবশে রাসূল (ছাঃ) তাকে নিজ স্ত্রীত্বে বরণ করে নেন।

(৩) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ২০ জনের একটি দল নিয়ে হিজরত করেন। পূর্বের প্রস্তাব আইয়াশ বিন আবী রাবী'আহ এবং হেশাম বিন 'আছ বিন ওয়ায়েল প্রত্যুষে একস্থানে হাযির হয়ে রওয়ানা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কাফেররা হেশাম (রাঃ)-কে বন্দী করে ফেলে। অতঃপর আইয়াশ (রাঃ) ওমর (রাঃ) সহ যখন মদীনায় 'ক্বোবা'-তে পৌঁছে গেলেন, তখন পিছে পিছে আবু জাহল ও তার ভাই হারেছ গিয়ে উপস্থিত হ'ল এবং বলল যে, হে আইয়াশ! তোমার ও আমার মা মানত করেছেন যে, যতক্ষণ তোমাকে দেখতে না পাবে, ততক্ষণ চুল আঁচড়াবে না এবং রোদ ছেড়ে ছায়ায় যাবে না'। একথা শুনে আইয়াশের মধ্যে মায়ের দরদ উথলে উঠলো এবং সাথে সাথে মক্কায় ফিরে যাওয়ার মনস্থ করল। ওমর (রাঃ) আবু জাহলের চালাকি আঁচ করতে পেরে আইয়াশকে নিষেধ করলেন এবং বুঝিয়ে বললেন যে, আল্লাহ্র কসম! তোমাকে তোমার দ্বীন থেকে সরিয়ে নেবার জন্য এরা কুট-কৌশল করেছে। আল্লাহ্র কসম! তোমার মাকে যদি উকুনে কষ্ট দেয়, তাহ'লে তিনি অবশ্যই চিরুনী ব্যবহার করবেন। আর যদি রোদে কষ্ট দেয়, তাহ'লে অবশ্যই তিনি ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নিবেন। অতএব তুমি ওদের চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়ো না। কিন্তু আইয়াশ কোন কথাই শুনলেন না। তখন ওমর (রাঃ) তাকে শেষ পরামর্শ দিয়ে বললেন, আমার এই দ্রুতগামী উটনীটা নিয়ে যাও। ওদের সঙ্গে একই উটে সওয়ার হয়ো না। মক্কায় গিয়ে উটটাকে নিজের আয়ত্তে রাখবে এবং কোনরূপ মন্দ আশংকা বুঝলে এতে সওয়ার হয়ে পালিয়ে আসবে। উল্লেখ্য যে, আবু জাহল, হারেছ ও আইয়াশ তিনজন ছিল একই মায়ের সন্তান।

মক্কার অদূরে পৌঁছে আবু জাহল চালাকি করে বলল, হে আইয়াশ! আমার উটটাকে নিয়ে খুব অসুবিধায় পড়েছি। তুমি কি আমাকে তোমার উটে সওয়ার করে নিবে? আইয়াশ সরল মনে রাযী হয়ে গেল এবং উট থামিয়ে মাটিতে নেমে পড়ল। তখন দু'জনে একত্রে আইয়াশের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে ফেলল এবং ঐ অবস্থায় মক্কায় পৌঁছল। এভাবে হেশাম ও আইয়াশ মক্কায় কাফেরদের একটি বন্দীশালায় আটকে পড়ে থাকলেন।

পরবর্তীতে রাসূল (ছাঃ) হিজরত করে মদীনায় গিয়ে একদিন সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, من لى بعيـــاش وهـــشام 'কে আছ যে আমার জন্য আইয়াশ ও হেশামকে মুক্ত করে আনবে?' তখন অলীদ ইবনুল অলীদ বলে উঠলেন انا لك يا رســـول الله 'আমি প্রস্তুত আপনার জন্য হে আল্লাহ্র রাসূল! অতঃপর তিনি গোপনে মক্কায় পৌঁছে ঐ বন্দীশালায় খাবার পরিবেশনকারীণী মহিলার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং দেওয়াল টপকে ছাদবিহীন উক্ত যিন্দানখানায় লাফিয়ে পড়ে তাদেরকে বাঁধনমুক্ত করে মদীনায় নিয়ে এলেন।

এইভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছাহাবায়ে কেরাম মক্কা হ'তে মদীনায় গোপনে পাড়ি জমাতে থাকেন। ফলে বায়'আতে কুবরার পরে দু'মাসের মধ্যেই প্রায় সকলে মদীনায় হিজরত করে যান। কেবল কিছু দুর্বল মুসলমান মক্কায় অবশিষ্ট থাকেন। যাদেরকে মুশরিকরা বলপূর্বক আটকে রেখেছিল।

হযরত আবুবকর (রাঃ) যেতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে নিষেধ করে বলেন, على رِسْـــلِكَ فانى أرجو أن يؤذن لى 'থেমে যাও! আমি আশা করছি যে, আমাকেও অনুমতি দেওয়া হবে'।[২] এভাবে রাসূল, আবুবকর ও আলী ব্যতীত মক্কায় আর কোন মুসলমান অবশিষ্ট থাকলেন না।

রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র

কুরায়েশ নেতারা দেখল যে, এত প্রতিবন্ধকতা ও অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেও যারা একবার ইসলাম কবুল করছে, তারা তা আর পরিত্যাগ করছে না এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা জন্মভূমি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। তাছাড়া বর্তমানে তারা মদীনায় গিয়ে অবস্থান নেওয়ায় তা কুরায়েশ নেতাদের জন্য ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সেই সাথে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক হুমকিও দেখা দিতে পারে। তারা একজোট হয়ে ইসলামে দীক্ষিত মদীনাবাসীদের নিয়ে মক্কায় হামলা চালাতে পারে।

২. *বুখারী হা/২২৯৭; ৩৯০৫।*

অতএব সবকিছুর মূল উপড়ে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে বায়'আতে কুবরা-র প্রায় আড়াই মাস পর চতুর্দশ নববী বর্ষের ২৬শে ছফর মোতাবেক ১২ই সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃষ্টাব্দ বৃহস্পতিবার দিনের প্রথম ভাগে তাদের অবিসংবাদিত সাবেক কুরায়েশ নেতা কুছাই বিন কিলাব প্রতিষ্ঠিত বৈঠক ঘর দারুন নাদওয়াতে কুরায়েশ-এর অধিকাংশ গোত্রনেতাদের এক যরূরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে (১) বনু মাখযূম গোত্র থেকে আবু জাহল (২) বনু নওফেল বিন আবদে মানাফ থেকে জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম বিন আদী, তু'আইমা বিন আদী ও হারেছ বিন আমের (৩) বনু আবদে শাম্স বিন আবদে মানাফ থেকে আবু সুফিয়ান বিন হারব এবং রাবী'আহ্র দুই পুত্র উৎবা ও শায়বা (৪) বনু আব্দিদ্দার হ'তে নযর ইবনুল হারিছ (৫) বনু আসাদ বিন আব্দুল উযযা থেকে আবুল বুখতারী বিন হেশাম, যাম'আহ ইবনুল আসওয়াদ ও হাকীম বিন হেযাম (৬) বনু সাহ্ম থেকে হাজ্জাজ-এর দুই পুত্র নাবীহ ও মুনাব্বিহ এবং (৭) বনু জুমাহ (نبو جمح) থেকে উমাইয়া বিন খালাফ। উল্লেখ্য যে, এই বৈঠকে রাসূলের গোত্র বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিবকে ডাকা হয়নি।

উপরোক্ত সাত গোত্রের ১৪ জন নেতা দারুন নাদওয়াতে পূর্বাহ্নে বসে আলোচনা শুরু করে। আবু জাহল প্রস্তাব দিয়ে বলল, প্রতি গোত্র থেকে একজন করে সুঠামদেহী যুবক বাছাই করে তাদেরকে তরবারি দেওয়া হৌক। অতঃপর তারা এসে একসাথে আঘাত করে তাকে শেষ করে দিক। এতে তিনটা লাভ হবে। এক- আমরা তার হাত থেকে বেঁচে যাব। দুই- তার গোত্র আমাদের সব গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহস করবে না। তিন- একজনের রক্তমূল্য বাবদ একশত উট আমরা সব গোত্র ভাগ করে দিয়ে দেব। যা কারু জন্য কষ্টকর হবে না'।

আবু জাহলের এই প্রস্তাবকে সকলে সানন্দে কবুল করল এবং এর উপরেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সবাই নিষ্ক্রান্ত হ'ল।

ষড়যন্ত্রকারী ১৪ জন নেতার পরিণতি :

উপরোক্ত ১৪ জন নেতার মধ্যে ১১ জন মাত্র দু'বছর পরে ২য় হিজরীর ১৭ রামাযানে সংঘটিত বদরের যুদ্ধে একদিনেই নিহত হয়। বাকী তিনজন জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম, হাকীম বিন হেযাম ও আবু সুফিয়ান ইবনু হারব পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে যান। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُمْ يَكِيدُوْنَ كَيْداً، وَأَكِيدُ كَيْداً– 'তারা জোরালো কৌশল করেছিল। আর আমিও কৌশল করি'। 'অতএব কাফেরদের ... কিছুদিনের জন্য অবকাশ দিন' *(ত্বারেক ৮৬/১৫-১৭)*।

রাসূলের গৃহ অবরোধ ও হিজরত :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যার নির্দয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর নেতারা সারা দিন প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা অন্ধকার রাতে এসে চারদিক থেকে বাড়ী ঘেরাও করে ফেলে। যাতে মধ্য রাত্রির পরেই হামলা করে নবীকে ঘুমন্ত অবস্থায় শেষ করে দেয়া যায়। এই অবরোধ কার্যে সশরীরে অংশ নেয় মোট ১১ জন। তার মধ্যে দারুন নাদওয়াতে বসে ষড়যন্ত্রকারী নেতাদের মধ্যেকার সাতজন ছিল আবু জাহল, নাযার ইবনুল হারেছ, উমাইয়া বিন খালাফ, যাম'আহ ইবনুল আসওয়াদ, তু'আইমা বিন আদী এবং দু'ভাই নাবীহ ও মুনাব্বিহ। বাকী চারজন ছিল হাকাম বিন আবুল 'আছ, ওক্বা বিন আবু মু'আইত্ব, আবু লাহাব ও উবাই বিন খালাফ।

আল্লাহ্র কৌশল :

কাফেররা তাদের কৌশলে পাকাপোক্ত ছিল। ওদিকে আল্লাহ্র কৌশল ছিল অন্যরূপ। যেমন তিনি বলেন, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ أَوْ يَقْتُلُوْكَ أَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ– 'স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল এজন্য যে, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে অথবা বিতাড়িত করবে। এভাবে তারা নিজেদের ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল, আর আল্লাহ স্বীয় কৌশল করছিলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হ'লেন শ্রেষ্ঠ কৌশলী' *(আনফাল ৮/৩০)*।

পূর্বাহ্নে যখন দারুন নাদওয়াতে রাসূলকে হত্যার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তখনই জিব্রীল মারফত রাসূলকে তা জানিয়ে দেওয়া হয় এবং রাতে নিজ শয্যায় ঘুমাতে নিষেধ করা হয়। এতেই হিজরতের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুপুরেই আবুবকর (রাঃ)-এর গৃহে তাশরীফ আনেন এবং হিজরতের সময়-সূচী ও অন্যান্য আলোচনা সম্পন্ন করেন। সেমতে আবুবকর (রাঃ) পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

রাত্রি বেলায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আলীকে তাঁর বিছানায় শুতে বলেন এবং তাঁর নিকটে রক্ষিত প্রতিবেশীদের আমানত সমূহ যথাস্থানে ফেরত দেবার দায়িত্ব দেন।

হিজরত শুরু :

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মধ্যরাতের সামান্য পরে ঘর

থেকে বেরিয়ে এলেন এবং শত্রুদের মাথার উপরে এক মুঠি কংকরযুক্ত মাটি ছড়িয়ে দিলেন সূরা ইয়াসীনের ৯নং আয়াতটি পাঠ করে *(যাদুল মা'আদ ৩/৪৬)*। যেখানে বলা হয়েছে, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُوْنَ– 'আর আমরা তাদের সম্মুখে ও পিছনে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করালাম। অতঃপর তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেললাম। ফলে তারা দেখতে পেল না' *(ইয়াসীন ৩৬/৯)*।

তিনি নির্বিঘ্নে বেরিয়ে এসে আবু বকরের গৃহে পৌঁছে গেলেন। অতঃপর তাকে নিয়ে উত্তরমুখী ব্যস্ত পথ ছেড়ে দক্ষিণ মুখী ইয়ামানের পথ ধরে পদব্রজে যাত্রা করলেন। অতঃপর মক্কার দক্ষিণ-পূর্বে ৩ কি:মি: দূরত্ব পাড়ি দিয়ে অন্ধকার থাকতেই ছওর পাহাড়ে পৌঁছে গেলেন। অতঃপর পাহাড়ের পাদ দেশে পৌঁছে আবুবকর রাসূলকে কাঁধে উঠিয়ে নেন ও ধারালো পর্বতগাত্র বেয়ে উঠে খাড়া পাহাড়টির শীর্ষদেশে একটি গুহা মুখে উপনীত হন। যাতে তার দু'পা ফেটে রক্তাক্ত হয়ে যায়। আবুবকর প্রথমে একাকী অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করে অতিরিক্ত একটি কাপড় ছিঁড়ে ছোট ছোট ছিদ্র মুখগুলো বন্ধ করে দিলেন। তারপর রাসূলকে ভিতরে ডেকে নিলেন। এই গুহাটিই ইতিহাসে 'গারে ছওর' নামে পরিচিত।

এই সংকটময় রাতের কথা বলতে গিয়ে ওমর (রাঃ) আল্লাহ্র কসম করে বলেন, والذى نفس بيده لتلك الليلة خير من آل عمر– 'ঐ এক রাতের আমল গোটা ওমর পরিবারের সারা জীবনের আমল অপেক্ষা উত্তম'।[৩] একবার তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'আমি আকাংখা রাখি যেন আমার সারা জীবনের আমল আবু বকরের শুধু একটি রাতের বা একটি দিনের আমলের সমপরিমাণ হিসাবে গণ্য হয়'।

চতুর্দশ নববী বর্ষের ২৭শে ছফর বৃহস্পতিবার দিবাগত শেষ রাতে মোতাবেক ৬২২ খৃষ্টাব্দের ১২/১৩ সেপ্টেম্বর তাঁরা মক্কার গৃহ ত্যাগ করে ভোরের দিকে ছওর গিরিগুহায় পৌঁছেন। সেখানে তাঁরা শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার তিনদিন তিন রাত অবস্থান করেন।

গৃহ থেকে গুহা- কিছু ঘটনাবলী :

(১) **অবরোধকারীদের প্রতিক্রিয়া :** রাসূলের গৃহ অবরোধকারীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় প্রহর গুণছে মধ্যরাত্রি পার হওয়ার। ওদিকে তার আগেই রাসূল (ছাঃ) তাদের সামনে দিয়ে চলে গেছেন। অথচ ওরা টেরই পায়নি। সকাল পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করল। কিন্তু পরে তারা আলীকে দেখে হতাশ হয়ে গেল। রাগে ও ক্ষোভে তারা আলীকে মারতে মারতে কা'বা গৃহ পর্যন্ত নিয়ে কিছু সময় আটকে রেখে পরে ছেড়ে দেয়। এরপর তারা আসে আবু বকরের গৃহে। সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করেও কিছু জানতে না পেরে নরাধম আবু জাহল ছোট্ট মেয়ে আসমা বিনতে আবুবকরের মুখে এমন জোরে চপেটাঘাত করে যে, তার কানের দুল ছিঁড়ে পড়ে যায় এবং কানের লতি ফেটে রক্তাক্ত হয়ে যায়।

(২) **মক্কা ত্যাগকালে রাসূলের প্রতিক্রিয়া :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মক্কা থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হন, তখন মক্কার জনবসতি ও বায়তুল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, اللهم انت أحبُّ البلاد إلى الله وأنت أحبُّ البلاد إلىّ ولولا المشركون أَهْلُك أَخْرَجُونِي لَمَا خرجتُ منك 'হে মক্কা নগরী! দুনিয়ার সমস্ত নগরীর চাইতে তুমিই আমার কাছে অধিক প্রিয়। যদি মক্কার লোকেরা আমাকে বের করে না দিত, তবে আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে কখনো পরিত্যাগ করতাম না'। এই সময় যে আয়াতটি নাযিল হয় তা নিম্নরূপ-

وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلاَ نَاصِرَ لَهُمْ–

'যে জনপদ তোমাকে বহিষ্কার করেছে, তার চাইতে কত শক্তিশালী জনপদকে আমরা ধ্বংস করেছি। অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৩)*। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, সূরা মুহাম্মাদ মাদানী সূরা হ'লেও এ আয়াতটি ছিল মাক্কী, কেননা এটি হিজরত কালে মক্কা ছাড়ার সাথে সাথে নাযিল হয়।

(৩) **গুহার মুখে শত্রু দল :** রাসূলকে না পেয়ে কোরায়েশ নেতারা চারিদিকে অনুসন্ধানী দল পাঠায় এবং ঘোষণা করে দেয় যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ও আবুবকরকে বা দু'জনের কাউকে জীবিত বা মৃত ধরে আনবে তাকে একশত উট পুরস্কার দেওয়া হবে। সন্ধানী দল এক সময় ছওর গুহার মুখে গিয়ে পৌঁছে। এমনকি আবুবকর (রাঃ) তাদের পা দেখতে পান। তাদের কেউ নীচের দিকে তাকালেই তাদের দেখতে পেত। ফলে তিনি রাসূলের জীবন নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে

৩. *হাকেম ৩/৭; যাহাবী ছহীহ মুরসাল বলেছেন।*

সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, لاَ تَحزن إن الله معنا 'দুঃখিত হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন'। বিষয়টির বর্ণনা আল্লাহ দিয়েছেন এভাবে-

إِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

'যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেররা তাকে বহিষ্কার করেছিল। তিনি ছিলেন দু'জনের একজন। যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় 'সাকীনাহ' (প্রশান্তি) নাযিল করলেন এবং তার সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখোনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহ্র কথা সদা সমুন্নত। আল্লাহ হ'লেন পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৯/৪০)*।

রক্তপিপাসু শত্রুকে সামনে রেখে ঐ সময়ের ঐ নাযুক অবস্থায় لاتحزن إن الله معنا এই ছোট্ট কথাটি মুখ দিয়ে বের হওয়া কেবলমাত্র তখনই সম্ভব, যখন একজন মানুষ সম্পূর্ণ রূপে কায়মনোচিত্তে আল্লাহ্র উপরে নিজেকে সোপর্দ করে দেন। দুনিয়াবী কোন উপায়-উপকরণের উপরে নির্ভরশীল ব্যক্তির পক্ষে এরূপ কথা বলা আদৌ সম্ভব নয়। বস্তুতঃ একথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সংকটকালে আরও কয়েকবার বলেছেন। এখানে 'অদৃশ্য বাহিনী' বলতে ফেরেশতাগণ হ'তে পারে কিংবা অন্য কোন অদৃশ্য শক্তি হ'তে পারে, যা মানুষের কল্পনার বাইরে। মূলতঃ সবই আল্লাহ্র বাহিনী। সবচেয়ে বড় কথা, সারা পাহাড় তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর গুহা মুখে পৌঁছেও তারা গুহার মধ্যে খুঁজল না, এমনকি তাকিয়েও দেখল না, তাদের এই মনের পরিবর্তনটাই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ছিল সরাসরি গায়েবী মদদ এবং রাসূলের অন্যতম মো'জেযা। আল্লাহ বলেন, وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ- 'তোমার প্রভুর সেনাবাহিনীর খবর তোমার প্রভু ব্যতীত কেউ জানে না' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩১)*। আর একারণেই হাযারো প্রস্তুতি নিয়েও অবশেষে কুফরীর ঝাণ্ডা অবনমিত হয় ও কালেমার ঝাণ্ডা সর্বদা উন্নীত হয়।

আবুবকর কন্যা আসমার ঈমানী তেজ :

(ক) বাসায় রক্ষিত পাঁচ/ছয় হাযার মুদ্রার সবই পিতা আবুবকর যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যান। তাঁরা চলে যাবার পর আসমার বৃদ্ধ ও অন্ধ দাদা আবু কোহাফা এসে আসমাকে বললেন, বেটি! আমি মনে করি, আবুবকর তোমাদের দ্বিগুণ কষ্টে ফেলে গেল। এক- সে নিজে চলে গেল। দুই- নগদ মুদ্রা সব নিয়ে গেল। একথা শুনে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে আসমা একটা পাথর কাপড়ে জড়িয়ে টাকা রাখার গর্তে রেখে এসে দাদাকে সেখানে নিয়ে গেল এবং দাদার হাত উক্ত গর্তের মধ্যে কাপড়ের গায়ে ধরিয়ে দিয়ে বলল, এই দেখ দাদু! আব্বা সব মুদ্রা রেখে গেছেন'। বুড়া তাতে মহা খুশী হয়ে বলল, যাক! এখন আবুবকর যাওয়াতে আমার কোন দুঃখ নেই। উল্লেখ্য যে, আবুবকর (রাঃ)-এর পিতা আবু ক্বোহাফা ঐ সময় কাফের ছিলেন। পরে তিনি মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হন।

জানা আবশ্যক যে, ছাহাবীগণের মধ্যে একমাত্র আবুবকর (রাঃ) এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, তার চার পুরুষ মুসলমান ও ছাহাবী ছিলেন। অর্থাৎ তিনি, তাঁর পিতা, তাঁর সন্তানগণ এবং তাদের সন্তানগণ। তন্মধ্যে খ্যাতনামা ছিলেন তাঁর দৌহিত্র আসমার পুত্র ও আয়েশার পালিত পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)। যিনি ছিলেন ১ম হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম মুহাজির সন্তান।

(খ) হিজরতের প্রাক্কালে আসমা সফরের মাল-সামান ও খাদ্য-সামগ্রী বাঁধার জন্য রশিতে কম পড়ায় নিজের কোমরবন্দ খুলে তা ছিঁড়ে দু'টুকরা করে এক অংশ দিয়ে থলির মুখ বাঁধেন ও বাকী অংশ দিয়ে নিজের কোমরবন্ধনীর কাজ সারেন। এ কারণে তিনি ذات النطاقين বা দুই কোমর বন্ধনীর অধিকারিণী উপাধিতে ভূষিত হন।

(গ) তাছাড়া আয়েশা (রাঃ) আসমার সাথে সকল কাজে সাহায্য করেন (ঘ) তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ পিতার সাথে রাতে গুহায় কাটাতেন ও ভোর রাতে বাড়ি ফিরে আসতেন। অত:পর শত্রুপক্ষের খবরাখবর নিয়ে রাতের বেলা পুনরায় গুহায় চলে যেতেন।[৪]

(ঙ) আবুবকরের গোলাম আমের বিন ফুহাইরা ছওর পর্বতের পার্শ্ববর্তী ময়দানে দিনের বেলা ছাগল চরাতো। তারপর রাতের একাংশ অতিবাহিত হ'লে সে ছাগল পাল নিয়ে ছওর পাহাড়ের পাদদেশে চলে আসত এবং গোপনে রাসূল ও আবুবকরকে দুধ পান করাত। তারপর ভোর হবার আগেই ছাগলপাল পুনরায় দূরে নিয়ে যেত।

৪. *বুখারী হা/৩৯০৫।*

এইভাবে দেখা যায় যে, আবুবকর (রাঃ)-এর পুরো পরিবার হিজরতের প্রস্তুতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

গুহা থেকে মদীনা :

তিনদিন ধরে খোঁজাখুজির পর ব্যর্থ মনোরথ হয়ে কাফেররা একপ্রকার রণে ভঙ্গ দিয়েছিল। আব্দুল্লাহ্র মাধ্যমে সব খবর জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবার ইয়াছরিব যাত্রার নির্দেশ দিলেন। এজন্য আবুবকর (রাঃ) পূর্বেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। দু'টি হৃষ্ট-পুষ্ট উট তিনি ঠিক করেছিলেন। তাছাড়া রাস্তা দেখানোর জন্য দক্ষ পথ প্রদর্শক আব্দুল্লাহ বিন আরীক্বত লায়ছীকে عبد الله بن اريقط الليثى উপযুক্ত মজুরীর মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। যদিও সে তখন কাফেরদের দলভুক্ত ছিল। চুক্তি মতে সে চতুর্থ রাত্রিতে দু'টি উট নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হ'ল। একটি উটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) এবং অন্যটিতে গোলাম আমের বিন ফুহায়রা ও পথপ্রদর্শক আব্দুল্লাহ বিন আরীক্বত সওয়ার হ'লেন।

১লা রবীউল আউয়াল সোমবার মোতাবেক ৬২২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর রাতে তাঁরা ছওর গিরি গুহা ছেড়ে ইয়াছরিব অভিমুখে রওয়ানা হ'লেন।

পথ প্রদর্শক আব্দুল্লাহ ইয়াছরিব যাওয়ার পরিচিত পথ ছেড়ে লোহিত সাগরের উপকূলের দিকে ইয়ামনের পথ ধরে চললেন। অতঃপর এমন এক পথে গেলেন, যে পথের সন্ধান সাধারণভাবে কেউ জানত না।

ছওর গুহা থেকে মদীনা : পথিমধ্যের কিছু ঘটনা

(১) যাত্রাবস্থায় আবুবকর (রাঃ) সর্বদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে বসেন। কেননা আবুবকরের মধ্যে বার্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু রাসূলের চেহারা-ছূরতে তখনো ছিল যৌবনের চাকচিক্য। তাই রাস্তায় লোকেরা কিছু জিজ্ঞেস করলে মুরব্বী ভেবে আবু বকরকেই করতো। সামনের লোকটির পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বলতেন, هذا الرجل يهدينى السبيل এ ব্যক্তি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন'।[৫] এর দ্বারা তিনি হেদায়াতের পথ বুঝাতেন। কিন্তু লোকেরা ভাবত রাস্তা দেখানো কোন লোক হবে। এর দ্বারা তিনি রাসূলের পরিচয় গোপন করতেন। আরবী অলংকার শাস্ত্রে এই দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্যকে 'তাওরিয়া' বলা হয়। যাতে একদিকে সত্য বলা হয়। অন্যদিকে শ্রোতাকেও বুঝানো যায়।

(২) উম্মে মা'বাদের তাঁবুতে : খোযা'আহ গোত্রের খ্যাতনাম্নী অতিথিপরায়ণ মহিলা উম্মে মা'বাদের খীমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পানাহারের কিছু আছে কি-না? ঐ মহিলার অভ্যাস ছিল তাঁবুর বাইরে বসে থাকতেন মেহমানের অপেক্ষায়। মেহমান পেলে তাকে কিছু না খাইয়ে ছাড়তেন না। কিন্তু এইদিন এমন হয়েছিল যে, বাড়ীতে পানাহারের মত কিছুই ছিল না। ঐ সময়টা ছিল ব্যাপক দুর্ভিক্ষের সময়। বকরীগুলো সব মাঠে নিয়ে গেছে স্বামী আবু মা'বাদ। একটা কৃশ দুর্বল বকরী যে মাঠে যাওয়ার মত শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, সেটা তাঁবুর এক কোনে বাঁধা ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেটাকে দোহন করার অনুমতি চাইলেন। উম্মে মা'বাদ বললেন, ওর পালানে কিছু থাকলে আমিই আপনাদের দোহন করে দিতাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বকরীটির বাঁটে 'বিসমিল্লাহ' বলে হাত রাখলেন ও বরকতের দো'আ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র ইচ্ছায় বকরীটির পালান দুধে পূর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি দোহন করতে থাকলেন। তাতে দ্রুত পাত্র পূর্ণ হয়ে গেল। প্রথমে বাড়ীওয়ালী উম্মে মা'বাদকে পান করালেন। তারপর সাথীদের এবং সবশেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে পান করলেন। এরপরে এক পাত্র পূর্ণ করে উম্মে মা'বাদের কাছে রেখে তারা পুনরায় যাত্রা করলেন।

অল্পক্ষণ পরেই আবু মা'বাদ বাড়ীতে ফিরে সব ঘটনা শুনে অবাক বিস্ময়ে বলে উঠলো- والله هذا صاحب قريش... لقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا– 'আল্লাহ্র কসম! ইনিতো কুরায়েশদের সেই মহান ব্যক্তি। যাঁর সম্পর্কে লোকেরা বিভিন্ন কথা বলে থাকে। আমার দৃঢ় ইচ্ছা আমি তার সাহচর্য বরণ করি এবং সুযোগ পেলে আমি তা অবশ্যই করব'।

আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বলেন, আমরা জানতাম না রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন পথে মদীনা গমন করেছেন। কিন্তু দেখা গেল যে, হঠাৎ মক্কার নিম্নভূমি থেকে জনৈক অদৃশ্য ব্যক্তি একটি কবিতা পাঠ করতে করতে এল এবং মানুষ তার পিছে পিছে চলছিল। তারা সবাই তার কবিতা শুনছিল। কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছিল না। এভাবে কবিতা বলতে বলতে মক্কার উচ্চভূমি দিয়ে আওয়াযটি বেরিয়ে চলে গেল। আর বারবার শোনা যাচ্ছিল لاتحزن إن الله معنا 'চিন্তিত হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন'। সেই সাথে পঠিত পাঁচ লাইন কবিতা শুনে আমরা বুঝেছিলাম যে, তিনি বিখ্যাত অতিথিপরায়ণ মহিলা উম্মে

৫. *বুখারী হা/৩৯১১।*

মা'বাদের তাঁবুতে অবতরণ করে ঐ পথ ধরে মদীনা গিয়েছেন।[৬] মূলতঃ আবুবকর পরিবারকে দুশ্চিন্তামুক্ত করার জন্য এটি ছিল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এলাহী বেতার বার্তা স্বরূপ। উক্ত বার্তায় পাঁচ লাইন বিশিষ্ট কবিতার প্রথম দু'টি লাইন ছিল নিম্নরূপ-

جزى الله رب العرش خيرجزاءه * رفيقين حلاّ خيمتى ام معبد

'আরশের মালিক আল্লাহ তার সর্বোত্তম বদলা দান করেছেন তাঁর দুই বন্ধুকে, যারা উম্মে মা'বাদের দুই তাঁবুতে অবতরণ করেছেন'।

هما نزلا بالبر وارتحلا به * وافلح من امسى رفيق محمد

'তারা কল্যাণের সাথে অবতরণ করেছেন এবং কল্যাণের সাথে গমন করেছেন। তিনি সফলকাম হয়েছেন যিনি মুহাম্মাদের বন্ধু হয়েছেন'।[৭]

উম্মে মা'বাদের তাঁবুতে অবতরণের ঘটনাটি ছিল সফরের দ্বিতীয় দিনের। *(আর-রাহীক্ব ১৭০)*

(৩) সুরাক্বা বিন মালেকের পশ্চাদ্ধাবন : বনু মুদলিজ গোত্রের নেতা সুরাকা বিন মালেক বিন জু'শুম জনৈক ব্যক্তির কাছে রাসূল গমনের সংবাদ শুনে পুরস্কারের লোভে দ্রুতগামী ঘোড়া ও তীর-ধনুক নিয়ে রাসূলের পিছে ধাওয়া করল। কিন্তু কাছে যেতেই ঘোড়ার পা দেবে গিয়ে সে চলন্ত ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ল। তখন তীর ছুঁড়তে গিয়ে তার পসন্দনীয় তীরটি খুঁজে পেল না। ইতিমধ্যে মুহাম্মাদী কাফেলা অনেক দূরে চলে গেল। সে পুনরায় ঘোড়া ছুটালো। কিন্তু এবারও একই অবস্থা হ'ল। কাছে পৌঁছতেই ঘোড়ার পা এমনভাবে দেবে গেল যে, তা আর উঠাতে পারে না। আবার সে তীর বের করার চেষ্টা করল। কিন্তু আগের মতই ব্যর্থ হ'ল। তার পসন্দনীয় তীরটি খুঁজে পেল না। তখনই তার মনে ভয় উপস্থিত হ'ল এবং এ বিশ্বাস দৃঢ় হ'ল যে, মুহাম্মাদকে নাগালে পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে তখন রাসূলের নিকটে নিরাপত্তা প্রার্থনা করল। এ আহ্বান শুনে মুহাম্মাদী কাফেলা থেমে গেল। সে কাছে গিয়ে রাসূলকে কিছু খাদ্য-সামগ্রী ও আসবাবপত্র দিতে চাইল। রাসূল (ছাঃ) কিছুই গ্রহণ করলেন না। সুরাকা বলল, আমাকে একটি 'নিরাপত্তা নামা' (كتاب أمن) লিখে দিন। তখন রাসূলের হুকুমে আমের বিন ফুহায়রা একটি চামড়ার উপরে তা লিখে দিলেন। অতঃপর রওয়ানা হ'লেন।[৮] লাভ হ'ল এই যে, ফেরার পথে সুরাকা অন্যান্যদের ফিরিয়ে নিয়ে গেল, যারা রাসূলের পিছু নিয়েছিল। এভাবে দিনের প্রথম ভাগে যে ছিল রক্ত পিপাসু দুশমন, দিনের শেষভাগে সেই হ'ল দেহরক্ষী বন্ধু।

সুরাক্বা বিন মালেক বিন জু'শুম আল-কেনানী যখন তার রাবেগ এলাকায় ফিরে যাচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমার অবস্থা তখন কেমন হবে, যখন তোমার হাতে কিসরার মূল্যবান কংকন পরানো হবে?[৯] বস্তুতঃ ওহোদ যুদ্ধের পরে সুরাক্বাহ মুসলমান হন। অতঃপর ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে যখন মাদায়েন বিজিত হয় এবং পারস্য সম্রাট কিসরার রাজমুকুট ও অমূল্য রত্নাদি তাঁর সম্মুখে আনা হয়, তখন তিনি সুরাকাকে আহ্বান করেন। অতঃপর তার হাতে কিসরার কংকন পরিয়ে দেন। এ সময় তার যবান থেকে বেরিয়ে যায়- الحمد لله، سوارى بن هرمز فى يدى سراقة بن مالك بن جعشم أعرابى من بنى مدلج- আল্লাহ্ আকবর! আল্লাহ্র কি মহত্ত্ব যে, সম্রাট কিসরার কংকন আজ বেদুইন সুরাকার হাতে শোভা পাচ্ছে'।[১০]

সুরাক্বা বিন মালেক যখন পিছু পিছু আসছিল, তখন আবুবকর ব্যস্ত হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, لاتحزن إن الله معنا 'চিন্তিত হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন'।[১১] এতে বুঝা যায় যে, উক্ত সান্ত্বনা বাক্যটি কেবল ছওর গিরিগুহায় নয়, অন্যত্র সংকটকালেও তিনি বলেছিলেন। ছওর গুহা থেকে রওয়ানা হওয়ার তৃতীয় দিনে ঘটনাটি ঘটেছিল।

(৪) বুরাইদা আসলামীর ইসলাম গ্রহণ : এরপর পথিমধ্যে বুরাইদা আসলামীর কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ হয়। বুরাইদা ছিলেন একজন বীরপুরুষ ও নিজ সম্প্রদায়ের নেতা। তিনি মক্কাবাসীদের ঘোষিত পুরস্কারের লোভে মুহাম্মাদের মাথা নেওয়ার জন্য অনুসন্ধানে ছিলেন। কিন্তু শিকার হাতে পেয়ে তিনিই ফের শিকারে পরিণত হ'লেন। রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে কিছু কথাবার্তাতেই তার মনে দারুণ রেখাপাত করে এবং সেখানেই তার সত্তর জন সাথী সহ ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর মাথার পাগড়ী খুলে বর্শার মাথায় বেঁধে তাকে ঝাণ্ডা বানিয়ে ঘোষণা বাণী প্রচার করতে করতে চললেন, قدجاء ملك الأمن والسلام، ليملأ الدنيا عدلاً

৬. *যাদুল মা'আদ ২/৫৩-৫৪।*
৭. *হাকেম ৩/৯-১০; ফিক্বহুস সীরাহ পৃ: ১৩১, আলবানী ছহীহ বলেছেন।*
৮. *বুখারী হা/৩৯০৬ 'আনছারদের মর্যাদা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪৫।*
৯. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/৬৯ 'মাদায়েন বিজয়ের কাহিনী'।*
১০. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/৬৯ 'মাদায়েন বিজয়ের কাহিনী'।*
১১. *বুখারী হা/৩৬৫২।*

وقسطًا– ‘শান্তি ও নিরাপত্তার বাদশাহ আগমন করেছেন। দুনিয়া এখন ইনছাফ ও ন্যায়বিচারে পূর্ণ হয়ে যাবে’।

(৫) যুবায়ের ইবনুল ‘আওয়ামের সাথে সাক্ষাত : পরবর্তী পর্যায়ে ছাহাবী যোবায়ের ইবনুল ‘আওয়ামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, যিনি মুসলমানদের একটি বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে সিরিয়া থেকে মদীনায় ফিরে আসছিলেন। ইনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)-কে এক সেট করে সাদা কাপড় প্রদান করেন। যোবায়ের ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর জামাতা এবং আসমা (রাঃ)-এর স্বামী এবং আশারায়ে মুবাশ্শারাহ্র অন্যতম মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন মহাবীর ছাহাবী ও মা আয়েশার পালিতপুত্র আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের স্বনামধন্য পিতা।

ক্বোবায় অবতরণ

একটানা আটদিন চলার পর ১৪ নববী বর্ষের ৮ই রবীউল আউয়াল মোতাবেক ৬২২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর সোমবার দুপুরে ক্বোবা। উপশহরে শ্বেত-শুভ্র বসন পরিহিত অবস্থায় তাঁরা অবতরণ করেন। এইদিন রাসূলের বয়স ৫৩ বছর পূর্ণ হয়। কোবায় মানুষের ঢল নামে। হাযারো মানুষের অভ্যর্থনার মধ্যেও রাসূল (ছাঃ) ছিলেন চুপচাপ। তাঁর উপরে হযরত আবুবকর চাদর দিয়ে ছায়া করলে লোকেরা রাসূলকে চিনতে পারে। এ সময় তাঁর উপরে ‘অহি’ নাযিল হয়- فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرٌ– জেনে রেখ, আল্লাহ, জিব্রীল ও সৎকর্মশীল মুমিনগণ তার সহায়। উপরন্তু ফেরেশতাগণও তার সাহায্যকারী’।[১২]

কোবায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনু আমর বিন আওফ গোত্রের কুলছূম বিন হাদামের (كلثوم بن الهدم) বাড়ীতে অবস্থান করেন। এদিকে হযরত আলীও মক্কায় তিনদিন অবস্থান করে গচ্ছিত আমানত সমূহ স্ব স্ব মালিককে ফেরত দানের পর মদীনায় চলে আসেন এবং রাসূলের সাথে কুলছূম বিন হাদামের বাড়ীতেই অবস্থান করতে থাকেন। কোবাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি ৪ দিন অবস্থান করেন। এতে মতভেদ থাকলেও এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, তিনি সোমবারে কোবায় অবতরণ করেন এবং শুক্রবারে সেখান থেকে ইয়াছরিবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ’ন। এ সময়ে তিনি সেখানে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন ও সেখানে ছালাত আদায় করেন। এই মসজিদ সম্পর্কেই সূরা তওবা ১০৮ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর তিনি ইয়াছরিবে তাঁর দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিবের মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জারকে সংবাদ দেন। বনু নাজ্জার ছিল খাযরাজ গোত্রভুক্ত। তারা সশস্ত্র প্রহরায় তাঁকে সাথে নিয়ে ইয়াছরিবের পথে যাত্রা করেন। বনু নাজ্জারকে রাসূলের মাতৃকুল বলার কারণ এই যে, রাসূলের প্রপিতামহ হাশেম বিন আবদে মানাফ ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম যাওয়ার পথে মদীনায় যাত্রা বিরতি করেন এবং সেখানে বনু নাজ্জার গোত্রের সালমা বিনতে আমর (سلمى بنت عمـــرو) নাম্মী এক মহিলাকে বিবাহ করেন। তিনি কিছুকাল সেখানে অবস্থান করেন। অতঃপর স্ত্রীকে গর্ভবতী অবস্থায় রেখে শাম চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি ফিলিস্তীনের গাযায় মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনাটি ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মের ৭৩ বছর পূর্বে ৪৯৭ খৃষ্টাব্দে। এ দিকে যথাসময়ে সন্তান ভূমিষ্ট হয়। কিন্তু সন্তানের মাথার চুল সাদা হওয়ায় তার নাম রাখা হয় ‘শায়বা’। শায়বার বয়স ১০ বছর হওয়া পর্যন্ত তার জন্মের খবর তার পিতৃগোষ্ঠী জানতে পারেনি। পরে তার চাচা মুত্ত্বালিব খবর জানতে পেরে মদীনায় যান ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে মক্কায় নিয়ে আসেন। মক্কার লোকেরা তাকে মুত্ত্বালিবের ক্রীতদাস ভেবে ‘আব্দুল মুত্ত্বালিব’ বলে ডাকে। সেই থেকে রাসূলের এই দাদা আসল নামের বদলে ‘আব্দুল মুত্ত্বালিব’ উপনামেই পরিচিত হন। এভাবে হাশেম-এর বিবাহের সূত্রে মদীনার বনু নাজ্জার হ’ল আব্দুল মুত্ত্বালিবের সরাসরি মাতুল গোষ্ঠী এবং একই কারণে মদীনা বাসীগণ মক্কার বনু হাশেমকে তাদের ভাগিনার গোষ্ঠী বলে গণ্য করে থাকে।

১ম জুম‘আ আদায়

ইয়াছরিবের উপকণ্ঠে পৌঁছে বনু সালেম বিন ‘আওফ গোত্রের ‘রানূনা’ (رَانُونَـــاء) উপত্যকায় ইসলামের ইতিহাসের ১ম জুম‘আ আদায় করেন।[১৩] যাতে একশত জন মুছল্লী শরীক ছিলেন। জুম‘আ পড়ে পুনরায় যাত্রা করে দক্ষিণ দিক থেকে তিনি ইয়াছরিবে প্রবেশ করেন। এদিন ছিল ১২ই রবীউল আওয়াল শুক্রবার। ইয়াছরিবের শত শত মানুষ তাকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানায়। হযরত বারা বিন আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলের আগমনে আমি মদীনাবাসীকে যত খুশী হ’তে দেখেছি, এত খুশী তাদের কখনো হ’তে দেখিনি। এমনকি ছোট্ট শিশু-কিশোররা বলতে থাকে, هذا رسول الله قد جـــاء ‘এই যে, আল্লাহ্র

১২. *তাহরীম ৬৬/৪, যাদুল মা‘আদ ৩/৫২; আর-রাহীক্ব পৃ: ১৭১।*

১৩. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/২১১।*

রাসূল এসে গেছেন'।[১৪] উচ্ছ্বসিত মানুষ ঐদিন থেকে তাদের শহরের নাম পরিবর্তন করে রাখে 'মদীনাতুর রাসূল' বা সংক্ষেপে মদীনা। এই সময় মদীনার ছোট ছোট মেয়েরা রাসূলকে স্বাগত জানিয়ে যে কবিতা পাঠ করে, তা ছিল নিম্নরূপ:

طلع البدر علينا + من ثنيات الوداع

ছানিয়াতুল বিদা টিলা সমূহ হ'তে আমাদের উপরে পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়েছে।

وجب الشكرعلينا + مادعا لله داع

আমাদের উপরে শুকরিয়া ওয়াজিব হয়েছে, এজন্য যে, আহ্বানকারী (রাসূল) আল্লাহ্র জন্য (আমাদেরকে) আহ্বান করেছেন।

ايها المبعوث فينا + جئت با لأمرالمطاع

হে আমাদের মধ্যে (আল্লাহ্র) প্রেরিত পুরুষ! আপনি এসেছেন অনুসরণীয় বিষয়বস্তু (ইসলাম) নিয়ে।[১৫]

'ছানিয়াহ' অর্থ টিলা। মদীনায় লোকেরা তাদের মেহমানদেরকে নিকটবর্তী এই টিলা সমূহ পর্যন্ত এসে বিদায় জানাতো। এজন্য এই টিলা 'ছানিয়াতুল বিদা' বা বিদায়া দানের টিলা নামে পরিচিত হয়।

ইয়াছরিবে প্রবেশের পর প্রত্যেক বাড়ীওয়ালা তার বাড়ীতে রাসূলকে মেহমান হিসাবে পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেকে উটের লাগাম ধরে টানতে থাকে। কিন্তু উট নিজের গতিতে চলে বর্তমানের মসজিদে নববীর স্থানে গিয়ে বসে পড়ে। কিন্তু রাসূল নামেননি। পরে উট পুনরায় উঠে কিছু দূর গিয়ে আবার সেখানেই ফিরে এসে বসে পড়ে। এটি ছিল রাসূলের মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জারের মহল্লা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চেয়েছিলেন এখানে অবতরণ করে তার মামুদের বংশের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে। আল্লাহ তার সে আশা পূরণ করে দেন। এখন বনু নাজ্জার গোত্রের লোকদের মধ্যে হিড়িক পড়ে গেল সবাই নিজ বাড়ীতে রাসূলকে নিতে চায়। আবু আইয়ূব আনছারী উটের পিঠ থেকে পালান উঠিয়ে নিজ বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ওদিকে আক্বাবাহ্র প্রথম বায়'আতকারী আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ) উটের লাগাম ধরে রইলেন। কেউ দাবী ছাড়তে চান না।

আবু আইয়ূবের বাড়ীতে অবতরণ

অবশেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কার বাড়ী নিকটে? আবু আইয়ূব বললেন, هذا دارى هذا بابى 'এই তো আমার বাড়ী, এইতো আমার দরজা।' তখন রাসূল (ছাঃ) তার বাড়ীতে গেলেন। আবুবকরও তাঁর সাথে গেলেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করেন, قوما على بركة الله تعالي 'আল্লাহ্র বরকতের উপরে তোমরা দু'জন (রাসূল ও আবুবকর) দাঁড়িয়ে যাও'।[১৬] এর মাধ্যমে তিনি সেখানে অবস্থান করার কথা ঘোষণা দেন।

নবী পরিবারের আগমন

কয়েক দিনের মধ্যেই নবীপত্নী হযরত সওদা বিনতে যাম'আহ এবং নবীকন্যা উম্মে কুলছূম ও ফাতেমা এবং উসামা বিন যায়েদ ও উম্মে আয়মন (উসামার আম্মা) মদীনায় পৌঁছে যান। এদের সকলকে আব্দুল্লাহ বিন আবুবকর তার পারিবারিক কাফেলার সাথে নিয়ে এসেছিলেন। যাদের মধ্যে হযরত আয়েশাও ছিলেন। কেবল নবী কন্যা যয়নব তার স্বামী আবুল 'আছের সঙ্গে রয়ে গেলেন। যারা বদর যুদ্ধের পরে চলে আসেন।

মদীনার আবহাওয়ার পরিবর্তন

মদীনায় এসে মুহাজিরগণের অনেকে অসুখে পড়েন। হযরত আবু বকর (রাঃ) কঠিন জ্বরে কাতর হয়ে কবিতা পাঠ করেন,

كل امرء مصبّح فى أهله + والموت أدنى من شراك نعله

'প্রত্যেক মানুষকে তার পরিবারে 'সুপ্রভাত' বলে সম্ভাষণ জানানো হয়। অথচ মৃত্যু সর্বদা জুতার ফিতার চাইতে নিকটবর্তী'। বেলালও অনুরূপ বিলাপ ধ্বনি করে কবিতা পাঠ করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) এসব কথা রাসূলের কাছে তুলে ধরেন। তখন তিনি আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করেন-

اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبًا وصححها وبارك فى صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها فى الجحفة-

'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নিকটে মদীনাকে প্রিয় করে দাও, যেমন মক্কা আমাদের প্রিয় ছিল। বরং তার চাইতে বেশী প্রিয়। তুমি মদীনাকে স্বাস্থ্যকর করে দাও, তার খাদ্য-শস্যে বরকত দাও এবং তার অসুখকে (রোগ-ব্যাধিকে) সরিয়ে দাও! বরং (দূরে) জোহফায় পৌঁছে দাও'।[১৭] ফলে

১৪. *বুখারী হা/৪৯৪১ 'তাফসীর' অধ্যায়।*
১৫. *আর-রাহীক্ব পৃ: ১৭২; যঈফাহ হা/৫৯৮।*
১৬. *বুখারী হা/৩৯১১।*
১৭. *বুখারী হা/৫৬৭৭।*

আল্লাহ্র ইচ্ছায় মদীনার অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায় এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরী হয়ে যায়।

আনছারগণের অপূর্ব ত্যাগ

আল্লাহ পাক ঈমানের বরকতে আনছারগণের মধ্যে এমন মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যে, মুহাজিরগণকে ভাই হিসাবে পাওয়ার জন্য প্রত্যেকে লালায়িত ছিল। যদিও তাদের মধ্যে সচ্ছলতা ছিল না। কিন্তু তারা ছিল প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা। সবাই মুহাজিরগণকে স্ব স্ব পরিবারে পেতে চায়। অবশেষে লটারীর ব্যবস্থা করা হয় এবং মুহাজিরগণকে আনছারদের সাথে ভাই ভাই হিসাবে ঈমানী বন্ধনে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়। তারা তাদের জমি, ব্যবসা ও বাড়ীতে তাদেরকে অংশীদার করে নেন। এমনকি যাদের দুই স্ত্রী ছিল, তারা এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে স্ত্রীহারা মুহাজির ভাইকে দিয়ে দেন। আনছারগণের এই ত্যাগ ও কুরবানীর প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন, وَيُـؤْثِرُوْنَ عَلَـى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوْقَ شُـحَّ نَفْـسِهِ فَأُوْلَئِـكَ هُـمُ الْمُفْلِحُـوْنَ– 'তারা নিজেদের উপরে মুহাজিরগণকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা নিজেরা ছিল অভাবগ্রস্ত। বস্তুতঃ যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই হ'ল সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯)*।

মাক্কী জীবন থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

(১) পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্র এবং পবিত্রতম স্থান কা'বা গৃহ ও মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসাবে সমগ্র আরব বিশ্বে মহা সম্মানিত এবং ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী কুরায়েশ নেতার গৃহে জন্মগ্রহণকারী বিশ্বনবীকে তার বংশের লোকেরা নবী হিসাবে মেনে নেয়নি। কারণ তারা এর মধ্যে তাদের দুনিয়াবী স্বার্থের ক্ষতি বুঝতে পেরেছিল। আর তারা আখেরাতের চাইতে দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। ফলে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয়েও তারা মুমিন হ'তে পারেনি। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُـؤْمِنِيْنَ– 'লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্র উপরে এবং শেষ দিবসের উপরে ঈমান এনেছি। অথচ তারা মুমিন নয়' *(বাক্বারাহ ২/৮)*।

(২) নবী বংশের লোক হওয়া, আল্লাহ্র ঘর তৈরী করা ও তার সেবক হওয়া পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। বরং সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্ব করা ও তার বিধান মেনে চলা এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোই হ'ল আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হওয়ার পূর্বশর্ত। যেমন আল্লাহ বলেন,

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ لاَ يَسْتَوُوْنَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ– الَّذِيْنَ آمَنُـوْا وَهَـاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَـةً عِنْدَ اللهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ–

'তোমরা কি হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ করা ও মসজিদুল হারামের আবাদ করাকে সেই ব্যক্তির সমান মনে কর, যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহ্র উপরে ও শেষ দিবসের উপরে এবং আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করেছে? এরা আল্লাহ্র নিকটে সমান নয়। আর আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের হেদায়াত করেন না'। 'যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করেছে, আল্লাহ্র নিকটে তাদের উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। আর তারাই হ'ল সফলকাম' *(তওবাহ ৯/১৯-২০)*।

(৩) আক্বীদায় পরিবর্তন না আসা পর্যন্ত সমাজের কোন মৌলিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয় না। যেমন আল্লাহ্র রাসূল নবী হওয়ার পূর্বে তরুণ বয়সে 'হিলফুল ফুযূল' নামক কল্যাণ সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন ও তাঁর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রমের জন্য সকলের প্রশংসা ভাজন হন এবং 'আল-আমীন' লকবে ভূষিত হন। কিন্তু তাতে সার্বিকভাবে সমাজের ও নেতৃত্বের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি।

(৪) সমাজের সত্যিকারের কল্যাণকামী ব্যক্তি নিজের চিন্তায় ও প্রচেষ্টায় যখন কোন কুল-কিনারা করতে পারেন না, তখন তিনি আল্লাহ্র নিকটে হেদায়াত প্রার্থনা করেন ও নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর উপরে সমর্পণ করে দেন। অতঃপর আল্লাহ্র দেখানো পথেই তিনি অগ্রসর হন। যেমন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ স্বীয় জীবনের প্রথম চল্লিশটি বছর অত্যন্ত সুনামের সাথে জীবন যাপন করলেও সমাজের বিপর্যয়কর অবস্থা পরিবর্তনের কোন পথ-পন্থা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অবশেষে নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নেন ও হেরা গুহায় দিন-রাত আল্লাহ্র সাহায্য কামনায় রত থাকেন। ফলে লায়লাতুল কদরের মহিমাময় মুহূর্তে আল্লাহ্র 'অহি' নেমে আসে হেদায়াতের দীপশিখা নিয়ে। শুরু হয় নবুঅতের শুভযাত্রা। বর্তমান যুগে আর 'অহি' নাযিল হবে না। কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন ও সুন্নাহ রয়েছে এবং

এছাড়াও ইলহাম অব্যাহত থাকবে। যা আল্লাহগত প্রাণ বান্দাদের নিকটে আল্লাহ প্রেরণ করে থাকেন।

(৫) রক্ত, বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল প্রভৃতি জাতি গঠনের অন্যতম উপাদান হ'লেও মূল উপাদান নয়। বরং ধর্মবিশ্বাস হ'ল জাতি গঠনের মূল উপাদান। আর সেকারণেই একই বংশের হওয়া সত্ত্বেও আবু লাহাব ও আবু জাহল হয়েছিল রাসূলের রক্তপিপাসু শত্রু। অথচ ভিনদেশী ও ভিন রক্ত-বর্ণ ও অঞ্চলের লোক হওয়া সত্ত্বেও বেলাল হয়েছিল রাসূলের বন্ধু। নিজ বংশের লোকেরা শত্রুতা করলেও ইয়াছরিবের লোকেরা হয়েছিল নবীর সাহায্যকারী। এ প্রক্রিয়া আজও বাস্তব হয়ে রয়েছে। যদিও ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদীরা একে অস্বীকার করতে চায় ও মানুষকে খাদ্য-পানীয় সর্বস্ব সাধারণ পশু শ্রেণীভুক্ত বলে দাবী করতে চায়।

(৬) বিশ্বাসগত পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সেখানে কোন বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। সেকারণ মাক্কী জীবনের তের বছরে অবতীর্ণ আয়াত সমূহ মূলতঃ তাওহীদ ও আখেরাত ভিত্তিক ছিল। সার্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যখন সফলতা আসেনি এবং ইতিমধ্যে ইয়াছরিবের কিছু লোক ইসলাম কবুল করে ও রাসূলকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দানের অঙ্গীকার করে বায়'আত গ্রহণ করে, তখনই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে হিজরতের নির্দেশ দেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সমাজ পরিবর্তনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণকারী লোকদের জন্য প্রয়োজনবোধে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য জন্মস্থান থেকে হিজরত করা আবশ্যক। যেখানে গিয়ে তারা দ্বীনের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে পারবেন।

(৭) আল্লাহ্র পথের পথিকগণ শত নির্যাতনেও আল্লাহ্র পথ হ'তে বিচ্যুত হন না। জান্নাতের বিনিময়ে তারা দুনিয়াবী কষ্ট ও দুঃখকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। মক্কার নির্যাতিত অসহায় মুসলমানদের অবস্থা বিশেষ করে বেলাল, খাব্বাব ও ইয়াসির পরিবারের লোমহর্ষক নির্যাতনের কাহিনী যেকোন মানুষকে তাড়িত করতে বাধ্য।

(৮) ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত হন এবং ইসলামের স্বার্থে প্রয়োজন বোধ করলে আল্লাহ তাদের রক্ষা করেন। যেমন হিজরতের রাতে ঘেরাওকারীদের হাত থেকে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অলৌকিকভাবে রক্ষা করেন। অতঃপর পথিমধ্যে ছওর গিরিগুহায় আগত শত্রুদের প্রস্থান, উম্মে মা'বাদের জীর্ণ-শীর্ণ দুর্বল বকরীর পালান হ'তে দুগ্ধস্রোত নির্গমন, সুরাকা বিন মালেকের পশ্চাদ্ধাবন ও ব্যর্থতা বরণ, ৭০ জন সাথী সহ রক্তপিয়াসী বুরাইদা আসলামীর ইসলাম গ্রহণ, 'দুঃখ করো না নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' বলে গায়েবী আওয়ায ও কবিতার ধ্বনি মক্কার নিম্নভূমি থেকে উচ্চভূমি দিয়ে পার হয়ে যাওয়া ও আবুবকর পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান, মক্কার কাফের আব্দুল্লাহ বিন আরীক্বত হিজরতকালে রাসূলের জন্য বিশ্বস্ত পথ প্রদর্শক নিযুক্ত হওয়া- এসবই ছিল আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের জন্য আল্লাহ্র অদৃশ্য ব্যবস্থাপনার অংশ বিশেষ। সর্বযুগেই আল্লাহ্র এ ব্যবস্থাপনা জারী থাকবে। যেমন তিনি বলেন, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ 'আমাদের দায়িত্ব হ'ল মুমিনদের সাহায্য করা' *(রূম ৩০/৪৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ 'আমাদের কর্তব্য হ'ল মুমিনদের নাজাত দেওয়া' *(ইউনুস ১০/১০৩)*।

(৯) কায়েমী স্বার্থবাদী নেতৃত্ব কখনোই সংস্কারের বাণীকে সহ্য করতে পারে না। তারা অহংকারে ফেটে পড়ে এবং নিজেদের চালু করা মনগড়া রীতি-পদ্ধতিকে সঠিক মনে করে ও তার উপরে হঠকারিতা করে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ– 'যখন তাকে বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে অহংকারে স্ফীত করে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। আর তা অবশ্যই মন্দতর ঠিকানা' *(বাক্বারাহ ২/২০৬)*। ইতিপূর্বে মূসার বিরুদ্ধে ফেরাঊন তার লোকদের একইরূপ বলেছিল, وَمَا أَهْدِيْكُمْ إِلاَّ سَبِيْلَ الرَّشَادِ 'আমি তোমাদেরকে কেবল কল্যাণের পথই দেখিয়ে থাকি' *(মুমিন/গাফের ৪০/২৯)*। অথচ তা ছিল জাহান্নামের পথ এবং মূসার পথ ছিল জান্নাতের পথ।

(১০) ঈমানী বন্ধন দুনিয়াবী বন্ধনের চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী। যেমন রক্তের বন্ধন হিসাবে চাচা আবু তালেব-এর নেতৃত্বে বনু হাশেম ও বনু মুত্ত্বালিব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সার্বিক সহযোগিতা করলেও তা টেকসই হয়নি। অবশেষে ঈমানী বন্ধনের আকর্ষণে রাসূলকে সুদূর ইয়াছরিবে হিজরত করতে হয় এবং সেখানে গিয়ে তিনি নতুন ঈমানী সমাজের গোড়াপত্তন করেন।

(১১) জনমত সংগঠন হ'ল ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার আবশ্যিক পূর্বশর্ত। এজন্য কোন চরমপন্থা বেছে নেওয়া রোগী মেরে রোগ চিকিৎসার শামিল। তাই মক্কার জনমত বিরুদ্ধে থাকায় আল্লাহ্র রাসূলকে মদীনায় হিজরত করতে হয়। অতঃপর অনুকূল জনমতের কারণে শত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মুনাফেকীর মধ্য দিয়েও তিনি সেখানে ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থা কায়েমে সক্ষম হন।

[ক্রমশঃ]

ইসলামে ভ্রাতৃত্ব

-ড.এ.এস.এম.আযীযুল্লাহ

(শেষ কিস্তি)

(ঙ) চোগলখুরী করা : কোন বিষয়ে একজনের নিকটে এক কথা, আবার অন্যজনের নিকটে আরেক কথা বলাকে চোগলখুরী বলে। এটি ইসলামী শরী'আতে হারাম। যারা এহেন গর্হিত কাজে লিপ্ত তারা চতুরতার আড়ালে নিজেদের প্রকৃত রূপটা লুকিয়ে রাখে। কিন্তু আল্লাহ বলেন, يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللهِ. 'এরা লোকদের কাছ থেকে নিজেদের কর্মকাণ্ড আড়াল রাখতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্র কাছ থেকে গোপন করতে পারে না' *(নিসা ৪/১০৮)*।

চোগলখোরের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। যেমন-

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১৮]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা ক্বিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক ঐ ব্যক্তিকে পাবে, যে দ্বিমুখী। সে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে আসে এবং আরেক মুখ নিয়ে ওদের কাছে আসে'।[১৯] ক্বিয়ামতের দিন চোগলখোরের জিহ্বা হবে আগুনের। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهُ لِسَانَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِّنْ نَّارٍ.

আম্মার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দ্বিমুখী, ক্বিয়ামতের দিন তার আগুনের দু'টি জিহ্বা হবে'।[২০] অপর হাদীছে আছে-

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ قَالُوْا بَلَى، اَلَّذِيْنَ إِذَا رُؤُوْا ذُكِرَ اللهُ، أَفَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟ قَالُوْا بَلَى، قَالَ: اَلْمَشَّاؤُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ اَلْمُفْسِدُوْنَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ، اَلْبَاغُوْنَ الْبُرَآءَ الْعَنَتَ.

আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের মধ্যকার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে অবহিত করব না? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তারা ঐ সকল লোক যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়। তিনি আরো বললেন, 'আমি কি তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্টতম লোকদের সম্পর্কে অবহিত করব না'? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, 'যারা চোগলখুরী করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে এবং পুণ্যবান লোকদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায়'।[২১]

চোগলখোরের শাস্তি সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, এ দুই ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। কোন বড় পাপের কারণে তাদের আযাব হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, বিষয়টি বড়। তাদের একজন চোগলখুরী করে বেড়াত, আরেকজন প্রস্রাবের সময় পর্দা করত না'।[২২]

পবিত্র কুরআনে এদের ব্যাপারে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা তার অনুসরণ কর না, যে কথায় কথায় কসম করে, যে লাঞ্ছিত, যে পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অন্যকে লাগিয়ে বেড়ায়' *(কলাম ৬৮/১০-১১)*।

যারা দ্বিমুখী তাদেরকে মানুষ বিশ্বাস করে না। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণ ও অকল্যাণের কথা বিবেচনায় রেখে চোগলখুরীর পথ পরিহার করা উচিত।

(চ) যুলুম বা অত্যাচার করা : কোন বস্তুকে উপযুক্ত অবস্থান থেকে স্থানান্তরিত করে অনুপযুক্ত স্থানে রাখাকে (وضع الشيئ فى غير محله) যুলুম বলে। স্বভাবগতভাবে মানুষের অন্তর আল্লাহ্কে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে মানুষ যখন তার বিপরীত কিছুকে কল্পনা বা বিশ্বাস করে অথবা অন্তরে স্থান দেয়, তখন তা স্বভাববিরোধী হওয়ার কারণে যুলুমের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। সে কারণেই মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় যুলুম' *(লোক্বমান ১৩)*। ব্যবহারিক অর্থে- সত্য ও ন্যায়কে পরিহার করে তার বিপরীতকে অনুসরণ করা এবং জান-মাল, মান-সম্মানের উপর আক্রমণ করাকে যুলুম বলা হয়।

---

১৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/ ৪৮২৩।*
১৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/ ৪৮২২।*
২০. *আবূদাঊদ হা/৪৮৭৩ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৩১০; সিলসিলা ছহীহা হা/৮৮৯, মিশকাত, হা/৪৮৪৬, হাদীছ হাসান।*
২১. *আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/ ৩২৩, আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/২৬০, ২৯৫, হাদীছ হাসান।*
২২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; বঙ্গানুবাদ রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৫৩৮; মিশকাত হা/৩৩৮।*

পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে সবলরা দুর্বলের উপর নানাভাবে অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে আসছে। অথচ এটি একটি জঘন্যতম অপরাধ। অত্যাচারী ব্যক্তিকে যেমন আল্লাহ পসন্দ করেন না, তেমনি মানুষও তাকে অপসন্দ করে। পবিত্র কুরআনে অত্যাচারীর পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। রাসূল (ছাঃ)ও বিভিন্ন হাদীছে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। যেমন- আবু যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তাঁর প্রভু আল্লাহ বলেছেন, 'হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুম করাকে নিজের উপর হারাম করেছি এবং তা তোমাদের মধ্যেও হারাম করে দিয়েছি। অতএব তোমরা পরস্পরের প্রতি যুলুম করবে না'।[২৩] তিনি আরো বলেন, اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যুলুম ক্বিয়ামতের দিন বহু অন্ধকারের কারণ হবে'।[২৪]

এ প্রসঙ্গে অপর এক হাদীছের বর্ণনা নিম্নরূপ- আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা কি জান নিঃস্ব কে? ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই তো নিঃস্ব যার টাকা-কড়ি ও ধন-সম্পদ নেই। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'যে দুনিয়া হ'তে ছালাত, ছিয়াম ও যাকাত আদায় করে আসবে এবং সাথে ঐ সকল লোকেরাও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারো অপবাদ রটিয়েছে, কারো মাল-সম্পদ গ্রাস করেছে, কাউকে হত্যা করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে। সুতরাং এই হকদারকে (যুলুমের বিনিময়ে) তার নেকী হ'তে প্রদান করা হবে, ঐ হকদারকে তার নেকী হ'তে প্রদান করা হবে। এভাবে সকল হকদারের হক পরিশোধ করার পূর্বে যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন তাদের গোনাহসমূহ ঐ ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[২৫] এ কারণেই রাসূল (ছাঃ) এ ব্যাপারে মুসলমানদেরকে সতর্ক করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি সম্মান কিংবা অন্য কোন বিষয়ে যুলুম করেছে, সে যেন আজই তার নিকট থেকে তা মাফ করে নেয়; ঐদিন আসার পূর্বে যেদিন তার নিকটে কোন দিরহাম ও দীনার থাকবে না। যদি তার নিকট নেক আমল থাকে, তবে তাথেকে তার যুলুম পরিমাণ নেকী নেওয়া হবে, আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মাযলূম ব্যক্তির গোনাহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে'।[২৬]

২৩. *মুসলিম, হা/২৫৭৭।*
২৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/৫১২৩।*
২৫. *মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত, হা/৫১২৭।*
২৬. *বুখারী, মিশকাত, হা/৫১২৬।*

মাযলূম এবং আল্লাহ্র মধ্যে কোন পর্দা থাকে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ. 'তুমি মাযলূমের বদদো'আ থেকে বেঁচে থাক। কেননা মাযলূমের বদদো'আ ও আল্লাহ্র মধ্যে কোন পর্দা থাকে না'।[২৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্য হাদীছে বলেন, ثَلاَثٌ دَعْوَاتٌ مُسْتَجَابَةٌ لاَشَكَّ فِيْهِنَّ، دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ. 'তিন ব্যক্তির দো'আ সন্দেহাতীতভাবে কবুল হয়ে থাকে। ১- মাযলূমের দো'আ ২- মুসাফিরের দো'আ ও ৩- সন্তানের জন্য পিতার দো'আ'।[২৮] তিনি (ছাঃ) আরো বলেন, دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا، فَفُجُوْرُهُ عَلَى نَفْسِهِ. 'মাযলূমের দো'আ কবুল হয়ে থাকে। যদি সে পাপাচারী হয় তবুও। (এমতাবস্থায়) তার পাপ তার উপর বর্তাবে'।[২৯]

যুলুম করা বা যুলুম থেকে বেঁচে থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ দো'আটি পড়তেন- اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ الْفَقْرِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِن الْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দারিদ্র্য, স্বল্পতা, লাঞ্ছনা এবং কারো প্রতি যুলুম করা বা যুলুমের শিকার হওয়া হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[৩০]

(ছ) আমানতের খেয়ানত করা : আমানতদারী একটি মহৎ গুণ। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে আমানত রক্ষায় ইসলামী শরী'আত বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার প্রকৃত হক্বদারকে প্রত্যর্পণ করতে' *(নিসা ৪/৫৮)*। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ নিজেই প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির পরিচয় ও গুণাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 'আর যারা নিজেদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে' *(মুমিনূন ২৩/৮; মা'আরিজ ৭০/৩২)*। মুনাফিকের লক্ষণের মধ্যে একটি অন্যতম লক্ষণ হল, وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. 'তার কাছে আমানত রাখলে খিয়ানত করে'।[৩১]

আমানতের খেয়ানত করা ক্বিয়ামতের আলামত। ক্বিয়ামতের পূর্বে আমানত উঠে যাওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ

২৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/১৭৭২।*
২৮. *তিরমিযী হা/১৯০৫ 'সদ্ব্যবহার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭, হাদীছ হাসান।*
২৯. *আহমাদ হা/৮৪৪০, ২/৩৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৮২, হাদীছ হাসান।*
৩০. *নাসাঈ হা/৫৪৬০ 'আশ্রয় প্রার্থনা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪, মিশকাত হা/২৪৬৭ হাদীছ ছহীহ।*
৩১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫।*

(ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি নিদ্রা গেল, তখন তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে, তখন একটি বিন্দুর মত চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। আবার ঘুমাবে। তখন আবার তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর তার চিহ্ন ফোস্কার মত অবশিষ্ট থাকবে। তোমার পায়ের উপর গড়িয়ে পড়া অঙ্গার সৃষ্ট চিহ্ন, যাকে তুমি ফোলা মনে করবে, প্রকৃতপক্ষে তাতে কিছুই থাকবে না। মানুষ বেচাকেনা করতে থাকবে বটে, কিন্তু কেউ আমানত আদায় করবে না। তারপর লোকেরা বলাবলি করবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক আছে। সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে যে, সে কতই না জ্ঞানী, কতই না হুঁশিয়ার, কতই না বাহাদুর? অথচ তার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে না'।[৩২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. 'যখন আমানতের খেয়ানত করা হবে তখন ক্বিয়ামতের প্রতীক্ষায় থেক'। আবূ হুরায়রা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কিভাবে আমানতের খেয়ানত করা হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জবাবে বললেন, إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. 'যখন অযোগ্য-অদক্ষ ব্যক্তিদের কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হবে, তখন তোমরা ক্বিয়ামতের প্রতীক্ষায় থেক'।[৩৩]

আমানতের খেয়ানত থেকে বেঁচে থাকার জন্য রাসূল (ছাঃ) এ দো'আটি পড়তেন- اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ! وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ. 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষুধা থেকে পানাহ চাচ্ছি। কেননা তা কতই না নিকৃষ্ট নিদ্রা-সাথী এবং তোমার নিকট খিয়ানত থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। কেননা তা কতই না মন্দ গোপন চরিত্র'।[৩৪]

আমানতের মূল ভিত্তি হ'ল বিশ্বাস। কেউ যখন আমানতের খিয়ানত করে, তখন সে তার বিশ্বস্ততা হারায়। যার ফলে সে জনবিচ্ছিন্নি হয়ে পড়ে।

(জ) ওয়াদা খেলাপ করা : আমানতের খেয়ানত করা, ওয়াদা খেলাপ করা এবং মিথ্যা বলা মুনাফেকীর লক্ষণ। আর মুনাফিকের শেষ ঠিকানা হ'ল জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে এবং তুমি তাদের কখনো কোন সহায় পাবে না' *(নিসা ৪/১৪৫)*। প্রকৃতপক্ষে যারা মুনাফিক তাদের বাহ্যিকভাবে চেনা কষ্টসাধ্য। কিন্তু পবিত্র কুরআনের ঘোষণা, 'আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা ঈমানদার এবং অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মুনাফিক' *(আনকাবূত ২৯/১১)*। শুধু প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হবেন না ক্বিয়ামতে তাদের কঠিন শাস্তি দিবেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী- যারা আল্লাহ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, তাদেরকে শাস্তি দিবেন' *(ফাতহ ৪৮/৬)*। ওয়াদা খেলাপকারীরা ক্বিয়ামতের দিন যেমন চরমভাবে লাঞ্ছিত হবে, তেমন দুনিয়াবী জীবনেও তারা চরমভাবে অপমানিত হয়ে থাকে। তাই কোন মুসলমানের চরিত্রে ওয়াদা খেলাপের মত ঘৃণ্য দোষ থাকা উচিত নয়।

(ঝ) অপমান করা : প্রত্যেক মানুষেরই আত্মসম্মানবোধ আছে। কেউ যখন কারো আত্মমর্যাদাহানি ঘটায়, তখন সে তার থেকে দূরে সরে যায়। তাছাড়া মুসলমান হিসাবে কারো মর্যাদাহানি ঘটানো ঠিক নয়। এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. 'একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে খুন করা, তার মাল গ্রাস করা ও তার সম্মানে আঘাত করা অর্থাৎ অপমান করা হারাম'।[৩৫]

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন আমাকে মি'রাজে গমন করানো হয়েছিল, তখন আমি এমন এক কওমের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখসমূহ ছিল তামার। তারা নখ দিয়ে নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশ খামচাচ্ছে। আমি বললাম, হে জিবরীল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা মানুষের গোশত খেত (গীবত করত) এবং তাদের মান-সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলত'।[৩৬] অন্য হাদীছে তিনি বলেন, مَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَىْءٍ يُرِيْدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرٍ جَهَنَّمَ حَتَّى يُخْرِجَ مِمَّا قَالَ. 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে কোন অপবাদ দিয়ে তার মর্যাদাহানি করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের সেতুতে আটকে দিবেন। যতক্ষণ না সে যা বলেছিল তা বের করে দেয়'।[৩৭] পক্ষান্তরে প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব হ'ল, তার অপর ভাইয়ের মান-সম্মান রক্ষা করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 'যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের মান-

৩২. *বুখারী হা/৬৪৯৭ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়; মুসলিম হা/২৩০ 'ঈমান' অধ্যায়।*
৩৩. *বুখারী হা/৬৪৯৬ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'আমানত উঠে যাওয়া' অনুচ্ছেদ।*
৩৪. *নাসাঈ হা/৫৪৬৮-৬৯ 'আশ্রয় চাওয়া' অধ্যায়, ১৯ ও ২০ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২৪৬৯, হাদীছ হাসান ছহীহ।*
৩৫. *মুসলিম; বঙ্গানুবাদ রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/১৫২৮।*
৩৬. *আবূদাঊদ, হা/৪৮৭৮; মিশকাত হা/৫০৪৬; বঙ্গানুবাদ রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/১৫২৭, হাদীছ ছহীহ।*
৩৭. *আবুদাঊদ হা/৪৮৮৩; মিশকাত হা/৪৯৮৬, হাদীছ হাসান।*

সম্মান রক্ষা করল, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন'।[৩৮]

(ঞ) ছিদ্রান্বেষণ করা : মানুষ মাত্রই কোন না কোন দোষে দোষী। শয়তানের কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে কোন ব্যক্তি যখন কোন অপরাধ করে, পরক্ষণে তার বিবেক জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে সে সারাক্ষণ উক্ত অপরাধের জন্য বিবেকের দংশনে জর্জরিত হ'তে থাকে। লোকচক্ষুর অন্তরালে সে মহান আল্লাহ্র নিকটে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। এহেন দোষত্রুটি খুঁজে বের করাকে 'ছিদ্রান্বেষণ' বলে। এটি কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَجَسَّسُوْا. 'তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কর না' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ. 'তুমি যদি মানুষের দোষ খুঁজে বেড়াও, তাহ'লে তুমি তাদেরকে ধ্বংস করলে অথবা প্রায় ধ্বংস করে ছাড়লে'।[৩৯]

(ট) উপহাস করা : কোন ব্যক্তিকে উপহাস বা তিরস্কার করা ইসলামের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে গর্হিত কাজ। ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে প্রত্যেক মুসলমানকে এসব বদঅভ্যাস অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। কোন মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার কোন দোষ এমনভাবে উল্লেখ করা, যাতে শ্রোতাদের মধ্যে হাসির খোরাক হয়। উপহাস কথায়, ভাবভঙ্গিমায় বা আকার-ইঙ্গিতেও হ'তে পারে। এরূপ কাজে উপহাসকারী অন্যকে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও হেয় করার মধ্য দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে থাকে। ইসলামী শরী'আতে এটি ঘৃণ্য অপরাধ। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কেন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হ'তে পারে। আর কোন নারীও যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হ'তে পারে' *(হুজুরাত ৪৯/১১)*।

মানুষের বাহ্যিক চালচলন ও আচার-আচরণ দেখে তাকে ভাল বা মন্দ বলা কঠিন। তাই দৃশ্যমান কার্যকলাপের মূল্যায়নে কাউকে ভাল বা মন্দ বলা ঠিক হবে না। এ ধরনের উপহাসকারীকে কেউ পসন্দ করে না।

(ঠ) তুচ্ছজ্ঞান বা হেয় প্রতিপন্ন করা : মানুষ মাত্রই আল্লাহ্র সৃষ্টি। সুতরাং একজন আরেকজনকে তুচ্ছ বা হেয়জ্ঞান করতে পারে না। যখন কোন ব্যক্তি কাউকে হেয়জ্ঞান করে তখন স্বভাবতই সে নিজেকে তার চেয়ে শ্রেয় মনে করে, যা অহংকারের পর্যায়ভুক্ত। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীছে জনৈক ছাহাবীর এক প্রশ্নের উত্তরে অহংকারের ব্যাখ্যা দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ. 'অহংকার হচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করা এবং লোকদের নীচুজ্ঞান করা'।[৪০] এজন্য কথা, কর্ম বা আচরণের মাধ্যমে কাউকে তুচ্ছজ্ঞান করা বা হেয় প্রতিপন্ন করা নিষেধ। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, بِحَسْبِ امْرِءٍ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يُّحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. 'এক ব্যক্তি গোনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে নীচুজ্ঞান করবে'।[৪১] অপর হাদীছে আছে, وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَيَحْقِرُهُ 'কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে না অপমান করবে, আর না তুচ্ছজ্ঞান করবে'।[৪২] সুতরাং কোন মুসলমানের পক্ষে মানুষকে হেয়জ্ঞান করা মহা অন্যায়।

(ড) ক্ষতিসাধন করা : ক্ষতি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। তবে সাধারণ অর্থে কোন মানুষের দ্বারা অপর মানুষের বাহ্যতঃ যেসব ক্ষতি হওয়া সম্ভব সেগুলোই উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি অপরের ক্ষতিসাধন করে সে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অভিসম্পাত প্রাপ্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللهُ به وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْه. 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ক্ষতিসাধন করল, আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল, আল্লাহ তাকে কষ্ট দিবেন'।[৪৩] এরূপ ব্যক্তিকে দুনিয়ার মানুষ না ভালবাসে, না তার সাথে মেলামেশা করে। তাই একজন মুসলমানের উচিত দ্বীনী ভাইয়ের কোন প্রকার ক্ষতিসাধন না করে সর্বদা তার কল্যাণ কামনা করা। এতে একদিকে যেমন ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জিত হবে।

(ঢ) ধোঁকা বা প্রতারণা করা : কথাবার্তা, লেনদেন বা কার্যকলাপে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া ইসলামী শরী'আতে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا 'যে আমাদের ধোঁকা দিবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[৪৪]

মা'কিল বিন ইয়াসার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ যে বান্দার উপর শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করেন, সে যদি তার অধীনস্তদের

---

৩৮. তিরমিযী, হা/১৯৩১, হাদীছ ছহীহ।
৩৯. আবূদাঊদ হা/৪৮৮৮, হাদীছ ছহীহ।
৪০. মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮ ।
৪১. মুসলিম, হা/২৫৬৪ ।
৪২. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৯।
৪৩. ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, হা/১৯৪০; মিশকাত হা/৫০৪২, হাদীছ হাসান।
৪৪. মুসলিম হা/১৬৪ 'ঈমান' অধ্যায়।

সাথে প্রতারণাকারী অবস্থায় মারা যায়, তাহ'লে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন'।[৪৫]

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ، وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِيْمٌ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ঈমানদার ব্যক্তি হয় উজ্জ্বল চরিত্র সম্পন্ন ও উদারহস্ত আর পাপাচারী লোক হয় শঠ এবং নীচু প্রকৃতির'।[৪৬] তাই নিজেকে সচ্চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখার লক্ষ্যে ধোঁকা ও প্রতারণার পথ পরিহার করা উচিত।

(ণ) হিংসা করা : হিংসা-বিদ্বেষ বা পরশ্রীকাতরতা একটি মারাত্মক ঘৃণ্য ও ক্ষতিকর অভ্যাস। পরশ্রীকাতরতার মধ্যে নিজের প্রাপ্তির চেয়ে অন্যের ক্ষতির কামনাটাই বেশি ক্রিয়াশীল থাকে। তাই ইসলামী শরী'আত হিংসাকে হারাম করেছে। শত্রুতা, অহংকার, ক্ষমতার মোহ প্রভৃতি কারণে একে অপরের প্রতি হিংসা করে থাকে। হিংসাকারীকে মানুষ ভালবাসে না। তাছাড়া হিংসার কারণে মানুষের নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছের শুরুতেই রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَتَحَاسَدُوْا 'তোমরা পরস্পর হিংসা কর না'।[৪৭] মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে হিংসুকের হিংসা থেকে পরিত্রাণ কামনায় উৎসাহ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 'আর হিংসুকের হিংসা থেকে (পরিত্রাণ চাই), যখন সে হিংসা করে' *(ফালাক্ব ১১৩/৫)*। সুতরাং এই ক্ষতিকর অভ্যাস পরিহার করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য।

উল্লেখ্য যে, কোন্ ক্ষেত্রে হিংসা করা যাবে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দুই ব্যক্তি ব্যতীত কেউ ঈর্ষার পাত্র নয়। প্রথম ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সাথে সাথে তাকে তা সত্যের পথে ব্যয় করার মানসিকতাও দান করেছেন এবং দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ হিকমত দিয়েছেন, সে তা দিয়ে ফায়ছালা করে এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেয়'।[৪৮]

(ত) অহঙ্কার করা : আত্মার ব্যাধিসমূহের মধ্যে অহংকার একটি মারাত্মক ব্যাধি। অহংকার হল নিজেকে অন্যের তুলনায় শ্রেয় বা বড় জ্ঞান করা এবং অন্যকে নিজের তুলনায় তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট মনে করা। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে ইবলীস। আল্লাহ যখন জান্নাতে সকল ফেরেশতাকে আদমকে সিজদা করার নির্দেশ দিলেন, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা ইবলীসকে জিজ্ঞেস করে বলেন, 'আমি নির্দেশ করার পরও তাকে সেজদা করতে তোমাকে কিসে নিষেধ করল?' *(আ'রাফ ৭/১২)*। তখন ইসলীস বলেছিল, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছ, আর তাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছ' *(আ'রাফ ৭/১২)*। মহান আল্লাহ তখন বলেন, 'এখান থেকে নেমে যাও। এখানে থেকে অহংকার করবে, তা হ'তে পারে না। সুতরাং তুমি বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত' *(আ'রাফ ৭/১৩)*।

অহংকারী ব্যক্তি যেহেতু নিজেকে অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে, সে কারণে সে সাধারণ মানুষের সাথে উঠা-বসা, পানাহার, কথাবার্তা ইত্যাদি থেকে নিজেকে বিরত রাখে। সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশার বিষয়টি তার শানের খেলাপ বলে মনে করে। সে কারণে আল্লাহ অহংকারীকে পসন্দ করেন না। পবিত্র কুরআনে লোকমান হাকীম কর্তৃক পুত্রকে প্রদত্ত উপদেশ বিধৃত হয়েছে, 'অহংকারবশে তুমি মানুষের সঙ্গে মুখ ভেংচিয়ে কথা বলবে না এবং পৃথিবীতে অহংকার প্রদর্শন করে বিচরণ করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন আত্মম্ভরি দাম্ভিককে পসন্দ করেন না' (লোক্বমান ৩১/১৮)। মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করবে না। তুমি তো কখনই পদভারে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনই পর্বত সমান হ'তে পারবে না' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৭)*। প্রচুর প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের অধিকারী কারূণকে আল্লাহ তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে বিলীন করে দিয়েছিলেন তার দাম্ভিকতার কারণে *(ক্বাছাছ ৭৬-৮১)*। অহংকার সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার ইযার। সুতরাং যে ব্যক্তি এর কোন একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে, আমি তাকে জাহান্নামে ঢুকাব'। অপর বর্ণনায় আছে, 'আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব'।[৪৯] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অপর এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ، ... اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ. 'যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ... অহংকার হল দম্ভের সাথে সত্যকে পরিত্যাগ করা এবং মানুষকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করা'।[৫০]

৪৫. বুখারী হা/৭১৫০ 'আহকাম' অধ্যায়; মুসলিম হা/২২৭ 'ঈমান' অধ্যায়।
৪৬. আবূদাঊদ হা/৪৭৯০; আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/৪১৮, হাদীছ ছহীহ ।
৪৭. মুসলিম, বুলূগুল মারাম, হা/ ১২৯১।
৪৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০২।
৪৯. মুসলিম, মিশকাত, হা/৫১১০।
৫০. মুসলিম হা/১৪৭, মিশকাত, হা/৫১০৮।

অহংকারীর পরিণতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছে আরো স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। আমর ইবনু শু'আয়েব তার পিতার সূত্রে এবং তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'অহংকারীরা ক্বিয়ামতের দিন মানুষরূপী পিপীলিকা সদৃশ হবে। লাঞ্ছনা ও অপমান চতুর্দিক থেকে তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে রাখবে। তাদেরকে জাহান্নামের একটি কারাগারের দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে, যার নাম বুলাস। তাদের জন্য জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হবে এবং তাদেরকে জাহান্নামীদের দুর্গন্ধময় ঘাম ও বিষাক্ত পানীয় পান করতে দেওয়া হবে'।[৫১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ. 'আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবগত করব না? তারা হ'ল- অনর্থক কথা নিয়ে বিবাদকারী, বদ মেজাযী, অহংকারী'।[৫২] দুনিয়াতেও স্বাভাবিক অবস্থায় অহংকারী ব্যক্তিকে মানুষ পসন্দ করে না। তাই ইহ ও পরকালীন মুক্তির স্বার্থে এই গর্হিত অভ্যাস থেকে প্রত্যেক মুমিনকে দূরে থাকা একান্ত যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَىَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لاَيَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট এ মর্মে অহী করেছেন যে, তোমরা নম্র হও। কেউ কারো উপর গর্ব কর না'।[৫৩]

(থ) মন্দ নামে ডাকা : পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির একটি বড় বিষয় হ'ল আন্তরিকতাপূর্ণ সম্বোধন। সেক্ষেত্রে কোন প্রকার ঘাটতি থাকলে হৃদ্যতারও ঘাটতি ঘটে। সমাজে অনেককে দেখা যায়, কোন ব্যক্তি হয়তো কখনো কোন অন্যায় কাজ করেছে, পরবর্তীতে তার নামের সাথে ঐ অপকর্মের পরিচিতি উল্লেখ করে আগে বা পরে উপাধি লাগানো হয়েছে। যা ঐ ব্যক্তির জন্য অবশ্যই কষ্টদায়ক। কাউকে লাঞ্ছিত করা, হেয় প্রতিপন্ন করা বা লজ্জা দেয়ার উদ্দেশ্যে এরূপ মন্দ নামে ডাকা ইসলামী শরী'আতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেক না; ঈমান আনার পরে কাউকে মন্দ নামে ডাকা পাপ' *(হুজুরাত ৪৯/১১)*। তাছাড়া কোন ব্যক্তি চায় না যে, তাকে কেউ মন্দ নামে সম্বোধন করুক। তাই অন্যের ক্ষেত্রেও এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। এ সম্পর্কে নিম্নের হাদীছটি স্মরণযোগ্য।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সেই মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! কোন বান্দা পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হ'তে পারবে না, যে পর্যন্ত সে কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্য সেটা পসন্দ না করে, যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে'।[৫৪] অবশ্য হাদীছটি ব্যাপক অর্থবোধক। তাই শুধু কাউকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অত্র হাদীছের অনুসরণ অতীব প্রয়োজন। ইসলামী শরী'আতের এই বিধান থেকে দূরে সরে থাকার কারণে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নষ্ট হচ্ছে। যার ফলে সমাজে নানা রকম অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে।

(দ) ক্রোধান্বিত হওয়া : ক্রোধ অত্যন্ত নিন্দনীয় আচরণ। কোন মানুষ যখন রাগান্বিত হয়ে উঠে, তখন তার আপাদমস্তক এমনকি শিরা-উপশিরায় এমন উত্তেজনা বিরাজ করে, যেন সে একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। একারণে রাগান্বিত অবস্থায় সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে এবং ন্যায়-নীতির সীমা অতিক্রম করে ফেলে। এ কারণেই ইসলামী শরী'আত ক্রোধকে মন্দ স্বভাব বলে আখ্যায়িত করেছে। সৃষ্টির উপাদানগত বৈশিষ্ট্যের কারণে পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে মানব শরীরে রাগ আসবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যেহেতু রাগ একটি ক্ষতিকর অভ্যাস, তাই একে সংবরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছে জনৈক ব্যক্তির উপদেশ প্রার্থনায় রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, لاَتَغْضَبْ 'তুমি রাগ কর না'।[৫৫] ক্রোধ সংবরণের ক্ষেত্রে নিম্নের হাদীছটি সুস্পষ্ট।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে প্রতিপক্ষকে মোকাবেলায় পরাভূত করে। বস্তুত সেই প্রকৃত বীর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে'।[৫৬]

আবু যার (রাঃ) বর্ণিত অপর এক হাদীছে ক্রোধ সংবরণের কৌশল হিসাবে বলা হয়েছে, إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ. 'যখন তোমাদের কেউ ক্রুদ্ধ হবে তখন দাঁড়িয়ে থাকলে সে যেন বসে যায়। এতেও যদি তার রাগ দূর না হয় তাহ'লে সে যেন শুয়ে পড়ে'।[৫৭]

ক্রোধ সংবরণ করার ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ أَنْ يُنَفِّذَهُ، دَعَاهُ اللهُ عَلَى

---

৫১. তিরমিযী হা/২৪৯২; মিশকাত হা/৫১১২; আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/৫৫৭, হাদীছ হাসান।

৫২. বুখারী হা/৬০৭১ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'অহংকার' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫১০৬।

৫৩. ইবনু মাজাহ হা/৪১৭৯; আবূদাঊদ হা/৪৯৫; সিলসিলা ছহীহা হা/৫৭০, হাদীছ ছহীহ।

৫৪. মুসলিম হা/৭২।

৫৫. বুখারী, মিশকাত, হা/৫১০৪।

৫৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/৫১০৫।

৫৭. আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাঊদ হা/৪৭৮২, মিশকাত, হা/৫১১৪, হাদীছ ছহীহ।

رُؤُوْسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِيْ أَيِّ الْحُوْرِ شَاءَ. 'যে ব্যক্তি বাস্তবায়ন করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রাগ চেপে রাখে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টজীবের সামনে তাকে আহ্বান করে যে কোন হূর নিজের জন্য পসন্দ করার অধিকার দিবেন'।[৫৮]

অন্য হাদীছে এসেছে, 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কোন ব্যক্তির রাগ দমন করার চেয়ে আল্লাহ্র নিকট বড় প্রতিদান আর নেই'।[৫৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দু'ব্যক্তি ঝগড়া করার সময় একজনের রাগান্বিত হওয়া ও চেহারা লাল হয়ে যাওয়া দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنِّىْ لَأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِىْ يَجِدُ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. 'আমি এমন একটি বাক্য জানি, যদি সে তা বলে তাহ'লে তার রাগ দূর হয়ে যাবে। সেটি হ'ল- 'আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম'- 'আমি বিতাড়িত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি'।[৬০] অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ. 'যখন তুমি ক্রুদ্ধ হবে তখন চুপ থাকবে'।[৬১] সুতরাং একজন মুসলমানের উচিত রাগান্বিত অবস্থায় সর্বোচ্চ ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া। এর মাধ্যমে যেকোন অনিষ্ট হ'তে যেমন রক্ষা পাওয়া সহজ হবে, তদ্রূপ পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্ববোধের সৌধও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

(ধ) সন্দেহযুক্ত আচরণ করা : কোন মুমিন ভাই বা বন্ধুর সম্মুখে এমন কোন আচরণ করা ঠিক হবে না, যার ফলে তার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এরকম আচরণ পারস্পরিক সম্পর্কে চিড় ধরায়। এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীছ প্রণিধানযোগ্য।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা তিন জন একত্রে থাকবে, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দুই জনে চুপে চুপে কথা বলবে না; অন্যান্য লোকের সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত। এটি এজন্য যে, এ (আচরণ) তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারে'।[৬২]

শুধু কানে কানে কথা বলাই নয়, বন্ধুর মনে সন্দেহ সৃষ্টি হ'তে পারে এরূপ সকল আচরণ ও কর্ম থেকে দূরে থাকা উচিত।

(ন) গালি দেওয়া : মুমিনের যবান সংযত থাকা একান্ত কাম্য। অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে পরিবেশ দূষিত করা তার জন্য শোভা পায় না। আচার-ব্যবহার ও ভাষার সৌন্দর্য পারস্পরিক বন্ধুত্ব সৃষ্টি ও তা স্থায়ীকরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. 'মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী ও হত্যা করা কুফরী'।[৬৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا مَالَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ. 'মাযলূম যদি সীমালংঘন না করে তাহ'লে দু'জন গালিগালাজকারী ব্যক্তির মধ্যে প্রথম যে সূচনাকারী তার উপর উভয়ের পাপ বর্তাবে'।[৬৪] আরেকটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ، وَيَتَكَاذَبَانِ. 'যারা একে অপরকে গালি দেয় তারা উভয়েই শয়তান। উভয়েই কটু কথা বলে এবং উভয়েই মিথ্যুক'।[৬৫]

উপসংহার : পৃথিবীর সকল মানুষ মুসলিম ও অমুসলিম- এই দুই ভাগে বিভক্ত। ইসলাম মুসলমানদের ধর্ম হ'লেও ইসলামের বিধান শুধুমাত্র মুসলমানদের ক্ষেত্রে নয়, সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মহান আল্লাহ যেমন আলো-বাতাস, খাদ্য-পানিতে মুসলিম-অমুসলিমে বেশ-কম করেন না। তদ্রূপ একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সাথে মৌলিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় জাতি, ধর্ম বা বর্ণের কোন বাছ-বিচার করা উচিত নয়। অর্থাৎ আদম সন্তান হিসাবে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। অতঃপর শারঈ বিধান মতে একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব আছে। সে সকল দায়িত্ব পালনের অন্যতম উপায় হল পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব স্থাপন। কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন বা শত্রুতার ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই সীমালঙ্ঘন করা ঠিক হবে না। আলী (রাঃ) ইবনুল কাওয়াকে লক্ষ্য করে বলেন, 'প্রবীণরা কি বলেছেন জান? তোমরা বন্ধুর প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন করতেও সীমার মধ্যে থাকবে। কাল হয়ত সে তোমার শত্রুতে পরিণত হবে। আর তোমরা শত্রুর প্রতি শত্রুতা পোষণ করতেও সীমার মধ্যে থাকবে। কাল সে তোমার বন্ধুতেও পরিণত হবে'।[৬৬] মহান আল্লাহ সকলকে শারঈ বিধান মোতাবেক সকলের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে দুনিয়াবী জীবনে শান্তি এবং পরকালীন জীবনে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমীন॥

---

৫৮. *ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৬; তিরমিযী হা/২০২১; সিলসিলা ছহীহা হা/১৭৫০, হাদীছ ছহীহ।*
৫৯. *ইবনু মাজাহ, হা/৪১৮৯, আহমাদ, মিশকাত হা/৫১১৬, হাদীছ ছহীহ।*
৬০. *বুখারী হা/৬১১৫; মুসলিম হা/২৬১০ 'সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে তার ফযীলত ও কিসের দ্বারা রাগ দূরীভূত হয়' অনুচ্ছেদ।*
৬১. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৩২০; সিলসিলা ছহীহা হা/১৩৭৫, হাদীছ ছহীহ লি-গায়রিহি।*
৬২. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৯৬৫।*
৬৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮১৪।*
৬৪. *তিরমিযী হা/১৯৮১, হাদীছ ছহীহ।*
৬৫. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪২৭, আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/২৮৫, হাদীছ ছহীহ।*
৬৬. *আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/১৩২১।*

জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত

মুযাফফর বিন মুহসিন

(৩য় কিস্তি)

(৭) কুলুখ নিয়ে হাঁটাহাঁটি করাঃ

কুলুখ নিয়ে হাঁটাহাঁটি করা, কাশি দেওয়া, নাচানাচি করা, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা, টয়লেটে কুলুখের আবর্জনার স্তূপ তৈরি করা সবই নব্য মূর্খতা। ইসলামে এরূপ বেহায়াপনার কোন স্থান নেই। মিথ্যা ফযীলতের ধোঁকা মানুষকে এত নীচে নামিয়েছে। এই অভ্যাস ইসলামের বিশ্বজনীন মর্যাদাকে চরমভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত জীবন বিধান। যাবতীয় নোংরামী এতে নিষিদ্ধ। শরী'আতে পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে তাই বলে এর নামে নতুন আরেকটি বিদ'আত তৈরি করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। পেশাবের ছিটা কাপড়ে লেগে যাওয়ার আশংকায় ইসলাম তার জন্য সুন্দর বিধান দিয়েছে। আর তা হ'ল, ওযূ করার পর হাতে পানি নিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দেওয়া। যেমন-

كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন পেশাব করতেন তখন ওযূ করতেন এবং পানি ছিটিয়ে দিতেন'।[৬৭] অন্য হাদীছে এসেছে, কাপড়ে তরল মযী লাগলেও তিনি পানি ছিটিয়ে দিতে বলতেন।[৬৮] অতএব প্রচলিত বেহায়াপনার আশ্রয় নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

(৮) ওযূর অবশিষ্ট পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা যাবে না এবং ইস্তিঞ্জা করার পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ করা যাবে না বলে ধারণা করাঃ

উক্ত বিশ্বাস সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে এ ধরনে কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় না। অথচ তাঁরা পাত্রে ওযূ করতেন এবং পাত্রের পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা সম্পন্ন করতেন।[৬৯] উল্লেখ্য যে, আবূদাঊদ ও নাসাঈতে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূল (ছাঃ) যে পাত্রের পানিতে ইস্তিঞ্জা করেন তার বিপরীত পাত্রে ওযূ করেন।[৭০] মূলতঃ পাত্রের পানি শেষ হয়ে গিয়েছিল বলেই অন্য পাত্র তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। মুহাদ্দিছগণ এমনটিই বলেছেন।[৭১]

(৯) পেশাব-পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর 'আল-হামদুলিল্লা-হিল্লাযি আযহাবা আন্নিল আযা ওয়া 'আফানী' দু'আ পাঠ করাঃ

টয়লেট সারার পর বলবে, 'গুফরা-নাকা'। যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।[৭২] 'আল-হামদুলিল্লা-হিল্লাযি.. মর্মে বর্ণিত হাদীছ যঈফ।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي.

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন পায়খানা থেকে বের হ'তেন তখন তিনি বলতেন, ঐ আল্লাহ্র যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমার কষ্ট দূর করেছেন ও আমাকে সুস্থ করেছেন।[৭৩]

তাহক্বীক্বঃ উক্ত বর্ণনার সনদে ইসমাঈল ইবনু মুসলিম নামে একজন রাবী আছে সে মুহাদ্দিছগণের ঐকমত্যে যঈফ।[৭৪]

(১০) ওযূর শুরুতে মুখে নিয়ত বলাঃ

মুখে নিয়ত বলার শারঈ কোন বিধান নেই। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এ ধরনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এটি মানুষের তৈরী বিধান। অতএব তা পরিত্যাগ করতে হবে। বরং মনে মনে নিয়ত করতে হবে।[৭৫] উল্লেখ্য যে, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর নামে প্রকাশিত 'পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা ও জরুরী মাসআলা মাসায়েল' নামক বইয়ে বলা হয়েছে যে, ক্বিবলার দিকে মুখ করে উঁচু স্থানে বসে ওযূ করতে হবে। অথচ উক্ত কথার প্রমাণে কোন দলীল পেশ করা হয়নি।[৭৬] উক্ত দাবী ভিত্তিহীন।

---

৬৭. ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৬৬ ও ৬৭, ১/২২ পৃঃ; মুসনাদে আহমাদ হা/১৭৫১৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৪১; মিশকাত হা/৩৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৮, ২/৬৮ পৃঃ; ছহীহ নাসাঈ হা/১৬৮; মিশকাত হা/৩৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৪, ২/৬৭ পৃঃ।

৬৮. ছহীহ আবূদাঊদ হা/২০৭, ১/২৭ পৃঃ।

৬৯. ছহীহ বুখারী হা/১৫০-১৫২; ছহীহ মুসলিম হা/৬৪৩; মিশকাত হা/৩৪২; ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৮; ১/১২৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৯৪, ৪১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬২, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭।

৭০. আবূদাঊদ হা/৪৫; নাসাঈ হা/৯৪; মিশকাত হা/৩৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৩, ২/৬৬ পৃঃ, 'পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ।

৭১. ليس المعنى أنه لا يجوز التوضىء بالماء الباقي من الاستنجاء أو بالإناء الذي استنجى به وإنما أتى بإناء آخر لأنه لم يبق من الأول شيء أو بقي قليل والإتيان بالإناء الآخر اتفاقي كان فيه الماء فأتى به -আল্লামা মুহাম্মাদ শামসুল হক আযীমাবাদী, আওনুল মা'বূদ শরহে সুনানে আবী দাঊদ (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৪১৫ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫।

৭২. ছহীহ আবূদাঊদ হা/৩০, ১/৫; তিরমিযী হা/৭, ১/৭।

৭৩. ইবনু মাজাহ হা/৩০১, পৃঃ ২৬; মিশকাত হা/৩৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪৫, ২/৭০ পৃঃ; বঙ্গানুবাদ সুনানু ইবনে মাজাহ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০০৫), হা/৩০১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৯-১৫০।

৭৪. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩০১।

৭৫. ছহীহ বুখারী হা/১; ছহীহ মুসলিম হা/৫০৩৬।

৭৬. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ), 'পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা ও জরুরী মাসআলা মাসায়েল', সংকলনে ও সম্পাদনায়- মাওলানা আজিজুল হক (ঢাকা: মীনা বুক হাউস, ৪৫, বাংলা বাজার, চতুর্থ মুদ্রণ-আগস্ট ২০০৯), পৃঃ ৪২; উল্লেখ্য যে, মাওলানার নামে বহু রকমের ছালাত শিক্ষা বইয়ের বাংলা অনুবাদ বাজারে চালু আছে। কোনটি যে আসল অনুবাদ তা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

(১১) ওযূর শুরুতে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম আল-ইসলামু হাক্কুন, ওয়াল কুফরু বাতিলুন, আল-ঈমানু নূরুন ওয়াল কুফরু যুলমাতুন' দু'আ পাঠ করা:

উক্ত দো'আর প্রমাণে কোন ছহীহ দলীল নেই। যদিওবা মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) উক্ত দো'আর সাথে আরো কিছু বাড়তি কথা যোগ করে তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোন প্রমাণ উল্লেখ করেননি।[৭৭] এটা পড়লে সুন্নাতের বিরোধিতা করা হবে। উক্ত দো'আটি দেশের বিভিন্ন মসজিদের ওযূখানায় লেখা দেখা যায়। উক্ত দো'আ হ'তে বিরত থাকতে হবে। বরং ওযূর শুরুতে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে।[৭৮]

(১২) প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করার সময় পৃথক পৃথক দো'আ পড়া:

ওযূর প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় পৃথক পৃথক দু'আ পড়তে হবে মর্মে আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন। এর পক্ষেও তিনি কোন দলীল তিনি পেশ করেননি। তবে অন্য শব্দে একটি জাল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

يا أنس ادن مني أعلمك مقادير الوضوء فدنوت فلمـــا أن غسل يديه قال بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله فلما استنجى قال اللهم حصن فرجي ويسر لي أمري فلما توضأ واستنشق قال اللهم لقني حجتي ولا تحـــرمني رائحة الجنة فلما غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه فلما أن غسل ذراعيه قال اللهم أعطني كتابي بيميني فلما أن مسح يده على رأسه قـــال اللـــهم أغثنـــا برحمتك وجنبنا عذابك فلما أن غسل قدميه قال اللـــهم ثبت قدمي يوم تزل فيه الأقدام ثم قال والذي بعثني بالحق يا أنس ما من عبد قالها عند وضوئه لم تقطر مـــن خلـــل أصابعه قطرة إلا خلق الله تعالى ملكا يسبح الله بـــسبعين لسانا يكون ثواب ذلك التسبيح إلى يوم القيامة.

(রাসূল (ছাঃ) বলেন) হে আনাস! তুমি আমার নিকটবর্তী হও তোমাকে ওযূর মিকদার শিক্ষা দিব। অতঃপর আমি তার নিকটবর্তী হ'লাম। তখন তিনি তাঁর দুই হাত ধৌত করার সময় বললেন, 'বিসমিল্লা-হি ওয়াল হামদুল্লি-হি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হি'। যখন তিনি ইস্তিঞ্জা করলেন তখন বললেন, 'আল্লা-হুম্মা হাছ্ছিন ফারজী ওয়া ইয়াস্সিরলী আমরী'। যখন তিনি ওযূ করেন ও নাক ঝাড়েন তখন বলেন, 'আল্লা-হুম্মা লাক্কিনী হুজ্জাতী ওয়ালা তারহামনী রায়েহাতাল জান্নাতি'। যখন তার মুখমণ্ডল ধৌত করেন তখন বললেন, 'আল্লা-হুম্মা বাইয়িয ওয়াজহী ইয়াওমা তাবইয়াযযু উজূহুওঁ'। যখন তিনি দুই হাত ধৌত করলেন তখন বললেন, 'আল্লাহুম্মা আ'ত্বিনী কিতাবী ইয়ামানী'। যখন হাত দ্বারা মাসাহ করলেন তখন বললেন, 'আল্লা-হুম্মা আগিছনা বিরহমাতিকা ওয়া জান্নিবনা আযাবাকা'। যখন তিনি দুই পা ধৌত করলেন তখন বললেন, 'আল্ল-হুম্মা ছাব্বিত ক্বাদামী ইয়াওমা তাযিল্লু ফীহি আক্বদাম'।

অতঃপর তিনি বলেন, হে আনাস! ঐ সত্তার কসম করে বলছি যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, যে বান্দা ওযূ করার সময় এই দু'আ বলবে তার আঙ্গুল সমূহের ফাঁক থেকে যত ফোঁটা পানি পড়বে তার প্রত্যেক ফোঁটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা একজন করে ফেরেশতা তৈরি করবেন। সেই ফেরেশতা সত্তরটি জিহ্বা দ্বারা আল্লাহ্র তাসবীহ্ বর্ণনা করবেন। এই ছওয়াব ক্বিয়ামত পর্যন্ত হ'তে থাকবে।[৭৯]

তাহক্বীক্ব: বর্ণনাটি জাল। এর সনদে উবাদা বিন ছুহাইব ও আহমাদ বিন হাশেমসহ কয়েকজন মিথ্যুক রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারী, নাসাঈ, দারাকুৎনীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ তাদেরকে পরিত্যক্ত বলেছেন। ইমাম নববী বলেন, এই বর্ণনাটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই।[৮০]

(১৩) ওযূর পানি পাত্রের মধ্যে পড়লে উক্ত পানি দ্বারা ওযূ হবে না বলে বিশ্বাস করা:

এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) লিখেছেন, 'উঁচু স্থানে বসবে যেন ওযূর পানির ছিটা শরীরে আসতে না পারে'।[৮১] অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাত্রের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিতেন আবার বের করতেন এভাবে তিনি ওযূ করতেন।[৮২]

(১৪) ত্রুটিপূর্ণ কথা বললে ওযূ নষ্ট হয়ে যায়। ওযূর সময় কথা বললে ফেরেশতারা রুমাল নিয়ে চলে যায়:

ওযূকারীর মাথার উপর চারজন ফেরেশতা রুমাল নিয়ে ছায়া করে রাখে। পর পর চারটি কথা বললে রুমাল নিয়ে চলে যায় বলে যে কাহিনী সমাজে প্রচলিত আছে তা উদ্ভট,

৭৭. পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা, পৃঃ ৪৩।
৭৮. ছহীহ তিরমিযী হা/২৫, ১/১৩ পৃঃ; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩৯৭, পৃঃ ৩২, সনদ হাসান।

৭৯. তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৩২; আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ, পৃঃ ১৩, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, হা/৩৩।
৮০. فَيْهِ عُبَادَةُ بْنُ صُهَيْب مُتَّهِمٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَتْرُوْكٌ وفَيهَ أحمد بن هاشم اتَّهمه الدارقطني وقد نص النووي بـــبُطْلَانَ هَذَا الْحَدِيْث وَأَنَّهُ لاَ أَصْلَ لَــهُ -তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৩২; আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ, পৃঃ ১৩, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, হা/৩৩।
৮১. পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা, পৃঃ ৪২।
৮২. ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৮; ১/১২৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৯৪, ৪১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬২, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭।

মিথ্যা ও কাল্পনিক। তাছাড়া খারাপ কথা বললে ওযূ নষ্ট হয়ে যায় এ আক্বীদাও ঠিক নয়। এ মর্মে যে হাদীছ রয়েছে তা জাল।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَثُ حَدَثَانِ حَدَثُ اللِّسَانِ وَحَدَثُ الْفَرْجِ وَلَيْسَا سَوَاءً حَدَثُ اللِّسَانِ أَشَدُّ مِنْ حَدَثِ الْفَرْجِ وَفِيْهَا الْوُضُوْءُ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, অপবিত্রতা দুই প্রকার। জিহ্বার ও লজ্জাস্থানের অপবিত্রতা। দুইটি এক রকম নয়। লজ্জাস্থানের অপবিত্রতার চেয়ে জিহ্বার অপবিত্র বেশি। আর এর কারণে ওযূ করতে হবে।[৮৩]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি যঈফ।[৮৪] এর সনদে বাক্বিয়াহ নামক রাবী রয়েছে, সে ত্রুটিপূর্ণ। সে দুর্বল রাবীদের নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনাকারী। রাসূল (ছাঃ) থেকে উক্ত মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি।[৮৫]

(১৫) কুলি করার জন্য আলাদা পানি নেওয়াঃ

সুন্নাত হল হাতে পানি নিয়ে একই সঙ্গে মুখে ও নাকে পানি দিবে। রাসূল (ছাঃ) এভাবেই ওযূ করতেন। যেমন-

مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ.

'তিনি এক অঞ্জলি দ্বারাই কুলি করেন ও নাক পরিষ্কার করেন'।[৮৬] আলাদাভাবে পানি নেওয়ার যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।

عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ دَخَلْتُ يَعْنِى عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيْلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ.

তালহা (রাঃ) তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি ওযূ করছিলেন। আর পানি তাঁর মুখমণ্ডল ও দাড়ি থেকে তাঁর বুকে পড়ছিল। অতঃপর আমি তাকে দেখলাম তিনি কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার সময় পৃথক করলেন।[৮৭]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি যঈফ। এর সনদে লাইছ ও মুছাররফ নামের দু'জন রাবী রয়েছে, যারা ত্রুটিপূর্ণ। এছাড়াও আরো ত্রুটি রয়েছে। এই হাদীছ যঈফ হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণ একমত।[৮৮] শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, তালক বিন মুছাররফের হাদীছ পৃথক করা প্রমাণ করে, কিন্তু তা যঈফ।[৮৯]

(১৬) কান মাসাহ করার সময় নতুন পানি নেওয়াঃ

ওযূতে কান মাসাহ করার ক্ষেত্রে মাথা ও কান একই সঙ্গে একই পানিতে মাসাহ করবে। কান মাসাহ করার জন্য পৃথকভাবে নতুন পানি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দুই কান মাথার অন্তর্ভুক্ত'।[৯০] বায়হাক্বীতে একই পানিতে মাথা ও কান মাসাহ করার ছহীহ হাদীছ এসেছে।[৯১] নতুনভাবে পানি নেওয়ার হাদীছটি ছহীহ নয়।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً غَيْرَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَأْسِهِ.

আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছেন যে, পানি দ্বারা মাথা মাসাহ করেছেন। অতঃপর তা ব্যতীত কান মাসাহ করার জন্য পৃথক পানি নিয়েছেন।[৯২]

তাহক্বীক্বঃ উক্ত শব্দে বর্ণিত হাদীছ যঈফ। উল্লেখ্য যে, উক্ত বর্ণনার পরে হাদীছটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও বায়হাক্বীর যে মন্তব্য ইবনু হাজার আসক্বালানী তুলে ধরেছেন তা মূলতঃ এই হাদীছের ক্ষেত্রে নয়; বরং হাত ধৌত করার পর নতুন করে পানি নিয়ে মাথা ও কান মাসাহ করা সংক্রান্ত হাদীছটির ব্যাপারে, যা ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।[৯৩] তাই আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন,

قُلْتُ لَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيْثٍ مَرْفُوْعٍ صَحِيْحٍ خَالٍ عَنِ الْكَلاَمِ يَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ لِمَاءٍ جَدِيْدٍ.

'আমি বলছি, সমালোচনা থেকে মুক্ত এমন কোন মারফূ হাদীছ এ ব্যাপারে আছে বলে আমি অবগত নই, যার দ্বারা নতুন পানি নিয়ে কান মাসাহ করা যাবে'।[৯৪]

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِإِصْبَعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ.

৮৩. আব্দুর রহমান ইবনু আলী ইবনিল জাওযী, আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ ফিল আহাদীছিল ওয়াহিয়াহ (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪০৩), হা/৬০৪; দায়লামী ২/১৬০, হা/২৮১৪; ইমাম সুয়ূত্বী, জামিউল আহাদীছ হা/১১৭২৬।
৮৪. জাওয়াযকানী, আল-আবাতিল ১/৩৫৩ পৃঃ।
৮৫. আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ হা/৬০৪-এর আলোচনা দ্রঃ।
৮৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/১৯১, ১/৩১ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৮, ১/১২৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৯৪ ও ৪১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬২, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭।
৮৭. আবূদাঊদ হা/১৩৯, ১/১৮-১৯ পৃঃ; বুলূগুল মারাম হা/৪৯, পৃঃ ১৮।
৮৮. যঈফ আবূদাঊদ হা/১৩৯-এর আলোচনা দ্রঃ।
৮৯. শরহে বুলূগুল মারাম, পৃঃ ২৬।
৯০. তিরমিযী হা/৩৭, ১/১৬ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৪৪৩ ও ৪৪৪, পৃঃ ৩৫, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৮৪।
৯১. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/২৫৬।
৯২. বায়হাক্বী, মা'রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/১৯১, ১/২২৯ পৃঃ; বলূগুল মারাম হা/৩৯, পৃঃ ২৩।
৯৩. ছহীহ মুসলিম হা/৫৮২, ১/১২৩ পৃঃ।
৯৪. তুহফাতুল আহওয়াযী ১/১২২ পৃঃ, হা/২৮-এর আলোচনা; বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৪৬ ও ৯৯৫; মাজমূঊ ফাতাওয়া আলবানী, পৃঃ ৩৬।

নাফে‘ বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) যখন ওযূ করতেন তখন কান মাসাহ করার জন্য দুই আঙ্গুলে পানি নিতেন।[৯৫]

তাহক্বীক্বঃ এ বর্ণনাটিও যঈফ। বায়হাক্বীর মুহাক্কিক মুহাম্মাদ আব্দুল ক্বাদির ‘আতা বলেন, রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, দুই কান মাথার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ঐ হাদীছগুলো যঈফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[৯৬]

উল্লেখ্য যে, ইবনু ওমর (রাঃ)-এর ব্যক্তিগত আমলকে ইবনুল ক্বাইয়িম ছহীহ হওয়ার কথা বলতে চেয়েছেন। কিন্তু উক্ত ত্রুটি থাকার কারণে তা যঈফ। যেমন তিনি বলেন, لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُمَا مَاءً جَدِيْدًا وَإِنَّمَا صَحَّ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ. ‘রাসূল (ছাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়নি যে তিনি দুই কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নিয়েছেন। তবে ইবনু ওমর থেকে সেটা ছহীহ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে’।[৯৭] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, لاَ حَاجَةَ لأَخْذ مَاء جَدِيْد مُنْفَرِد لِمَسْحِ الْأُذُنَيْنِ غَيْرَ مَاءِ الرَّأْسِ بَلْ يَجْزِيْ مَسْحُهُمَا بِبَلَلِ مَاءِ الرَّأْسِ. ‘দুই কান এককভাবে মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং মাথার জন্য ভিজা পানি দ্বারাই দুই কান মাসাহ করা জায়েয’।[৯৮]

অতএব কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়ার প্রয়োজন নেই; বরং মাথা ও কান একই সঙ্গে মাসাহ করতে হবে।

জ্ঞতব্যঃ অনেকে কান মাসাহকে ফরয বলেন না। অথচ কানসহ মাথা মাসাহ করা ফরয। কারণ দুই কান মাথার অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘দুই কান মাথার অন্তর্ভুক্ত’।[৯৯] তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) একই পানিতে মাথা ও কান মাসাহ করতেন। যেমন- ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ. ‘অতঃপর তিনি এক অঞ্জলি পানি নিতেন এবং মাথা ও দুই কান মাসাহ করতেন’।[১০০]

(১৭) মাথা ও কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি না নেওয়াঃ

অনেকে দুই হাত ধৌত করার পর সরাসরি মাথা মাসাহ করেন, নতুন পানি নেন না। যেমন আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেছেন, ‘কান ও মাথা মাছহে করার জন্য নতুন পানি নেয়ার প্রয়োজন নেই, ভেজা হাত দ্বারাই মাছহে করবে’।[১০১] এটি সুন্নাতের বরখেলাফ। কারণ রাসূল (ছাঃ) দুই হাত ধৌত করার পর নতুন পানি নিয়ে মাথা ও কান মাসাহ করতেন। যেমন- مَسَحَ بِرَأْسِه بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِه ‘হাতের অতিরিক্ত পানি ছাড়াই তিনি নতুন পানি দ্বারা তাঁর মাথা মাসাহ করতেন’।[১০২]

(১৮) মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসাহ করাঃ

মাথা মাসাহ করার ব্যাপারে অবহেলা ও উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। কেউ চুল স্পর্শ করাকেই মাসাহ মনে করেন, কেউ মাথার চার ভাগের একভাগ মাসাহ করেন এবং কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় নেমে পড়েন। কুদূরী ও হেদায়ার লেখক চার ভাগের এক ভাগ মাসাহ করার কথা উল্লেখ করেছেন। আর দলীল হিসাবে পেশ করেছেন ছহীহ মুসলিমের হাদীছ। অথচ উক্ত হাদীছে পাগড়ী থাকা অবস্থায় মাসাহ করা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কুদূরী এবং হেদায়াতে মুগীরা (রা)-এর নামে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা ভুল হয়েছে।[১০৩] যা হেদায়ার টীকাতেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তারা দুইটি হাদীছকে একত্রে মিশ্রিত করে উল্লেখ করেছেন।[১০৪]

সুধী পাঠক! শরী‘আতের ব্যাখ্যা হিসাবে হাদীছে রাসূল (ছাঃ) সুন্দরভাবে মাথা মাসাহ করার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। কারণ পবিত্র কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) মাথার সামনের দিক থেকে শুরু করে পিছনে চুলের শেষ পর্যন্ত দুই হাত নিয়ে যেতেন এবং সেখান থেকে সামনে নিয়ে এসে শেষ করতেন। এভাবে তিনি পুরো মাথা মাসাহ করতেন। যেমন-

ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ.

‘অতঃপর তিনি তাঁর দুই হাত দ্বারা মাথা মাসাহ করেন। এতে দুই হাত তিনি সামনে করেন এবং পিছনে নেন। তিনি মাথার অগ্রভাগ থেকে শুরু করে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যেতেন অতঃপর যে স্থান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে আবার

৯৫. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৩১৪; মুওয়াত্ত্ব হা/৯২।
৯৬. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال الأذنان من الرأس فروى ذلك بأسانيد ضعاف-ঐ, বায়হাক্বী হা/৩১৭-এর ভাষ্য দ্রঃ।
৯৭. ইমাম শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ১/২০০ পৃঃ; বুলূগুল মারাম, পৃঃ ২৩-এর উক্ত হাদীছের ভাষ্য দ্রঃ।
৯৮. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৬-এর ভাষ্য দ্রঃ।
৯৯. তিরমিযী হা/৩৭, ১/১৬ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৪৪৩ ও ৪৪৪, পৃঃ ৩৫, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৮৪।
১০০. ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৩৭; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/২৫৬; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা হা/১৬১, সনদ ছহীহ।
১০১. পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা, পৃঃ ৪২।
১০২. ছহীহ মুসলিম হা/৫৮২, ১/১২৩ পৃঃ, ‘নবী (ছাঃ)-এর ওযূ’ অনুচ্ছেদ।
১০৩. দ্রঃ ছহীহ মুসলিম হা/৬৪৭, ১/১৩৩ পৃঃ ও হা/৬৫৬, ১/১৩৪ পৃঃ।
১০৪. আবুল হাসান বিন আহমাদ বিন জা‘ফর আল-বাগদাদী আল-কুদূরী, মুখতাছারুল কুদূরী (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার ১৯৮২/১৪০৩), পৃঃ ৩; শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনু আবী বকর আল-মারগীনানী (৫১১-৫৯৩ হিঃ), আল-হেদায়াহ (নাদিয়াতুল কুরআন কুতুবখানা (১৪০১), ১/১৭ পৃঃ; বঙ্গানুবাদ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তৃতীয় সংস্করণ মার্চ ২০০৬), ১/৬ পৃঃ।

ফিরিয়ে নিয়ে আসেন'।[১০৫] ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৪১ হিঃ) বলেন,

وَلَمْ يَصِحّ عَنْهُ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْضِ رَأْسِهِ الْبَتَّةَ.

'রাসূল (ছাঃ) কখনো মাথার কিছু অংশ মাসাহ করেছেন মর্মে কোন একটি হাদীছ থেকেও প্রমাণিত হয়নি'।[১০৬]

উল্লেখ্য, পাগড়ী পরা অবস্থায় থাকলে মাথার অগ্রভাগ মাসাহ করা যাবে।[১০৭] আরো উল্লেখ্য যে, পাগড়ীর নীচে মাসাহ করতেন বলে যে হাদীছ আবূদাঊদে বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ।[১০৮]

(১৯) ওযূতে ঘাড় মাসাহ করাঃ

ওযূতে ঘাড় মাসাহ করার পক্ষে ছহীহ কোন প্রমাণ নেই। এর পক্ষে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই জাল ও মিথ্যা। অথচ আলেমগণ এর পক্ষে মুসলিম জনতাকে উৎসাহিত করেছেন। আশরাফ আলী থানবী ঘাড় মাসাহ করার দাবী করেছেন এবং এ সময় পৃথক দো'আ পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন।[১০৯] ড. শাইখ মুহাম্মাদ ইলিয়াস ফয়সাল (মদীনা মুনাওয়ারাহ) প্রণীত ও মারকাযুদ-দাওয়াহ আল-ইসলামিইয়াহ, ঢাকার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আব্দুল্লাহ অনূদিত 'নবীযীর নামায' বইয়ে ওযূর সুন্নাত আলোচনা করতে গিয়ে গর্দান মাসাহ করার কথা বলেছেন। এর পক্ষে জাল হাদীছও পেশ করেছেন।[১১০] এভাবেই ভিত্তিহীন আমলটি সমাজে বিস্তার লাভ করেছে। জাল দলীলগুলো নিম্নরূপ:

(١) عَنْ وَائِلِ بن حُجْرٍ... فِيْ صِفَةِ وَضُوْءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا وَمَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ رُقْبَتَهُ وَبَاطِنَ لِحْيَتِهِ بِفَضْلِ مَاءِ الرَّأْسِ...

(এক) ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর ওযূর পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করেন। ..অতঃপর তিনি তিনবার তার মাথা মাসাহ করেন এবং দুই কানের পিঠ মাসাহ করেন ও ঘাড় মাসাহ করেন, দাড়ির পেট মাসাহ করেন মাথার অতিরিক্ত পানি দিয়ে।[১১১]

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি জাল।[১১২] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন,

هَذَا مَوْضُوْعٌ لَيْسَ مِنْ كَلاَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'এটা জাল। নবী (ছাঃ)-এর বক্তব্য নয়'।[১১৩]

(٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ كَعْبٍ قال رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بَاطِنَ لِحْيَتِهِ وَقَفَاهُ.

(দুই) আমর ইবনু কা'ব বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ওযূ করার সময় আমি দাড়ির পেট এবং ঘাড় মাসাহ করতে দেখেছি।[১১৪]

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি জাল। ইবনুল ক্বাত্ত্বান বলেন, এর সনদ অপরিচিত। মুছাররফসহ তার পিতা ও দাদা সবাই অপরিচিত।[১১৫]

(٣) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا.

(তিন) তালহা ইবনু মুছাররফ তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি তিনি একবার তাঁর মাথা মাসাহ করতেন এমনকি তিনি মাথার পশ্চাদ্ভাগ পর্যন্ত পৌঁছাতেন। আর তা হ'ল ঘাড়ের অগ্রভাগ।[১১৬]

তাহক্বীক্বঃ হাদীছটি মুনকার বা অস্বীকৃত। মুসাদ্দাদ বলেন, তিনি মাথার সামনের দিক থেকে পিছনের দিক পর্যন্ত মাসাহ করেন এমনকি তার দুই হাত কানের নিচ দিয়ে বের করে নেন' এই কথা ইয়াহইয়ার কাছে বর্ণনা করলে তিনি একে অস্বীকৃতি জানান। ইমাম আবূদাঊদ বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে বলতে শুনেছি, ইবনু উ'আইনাহ বলতেন, মুহাদ্দিছগণ ধারণা করতেন এটা ছহীহ হাদীছের বিরোধী। তিনি এটাও বলতেন, তালহা তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে এ কথা কোথায় পেল?[১১৭]

(٤) مَسْحُ الرُّقْبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغُلِّ.

(চার) 'ঘাড় মাসাহ করলে বেড়ী থেকে নিরাপদ থাকবে'।

---

১০৫. ছহীহ বুখারী হা/১৮৫, ১/৩১ পৃঃ; বুখারী (ইফাবা) হা/১৮৫; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬২, ২/৭৮ পৃঃ; ছহীহ তিরমিযী হা/৩৪।
১০৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/১৮৫ পৃঃ, 'মাসাহ করার বর্ণনা'।
১০৭. ছহীহ মুসলিম হা/৬৫৬, ৫৭, ৫৯, ১/১৩৪ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৯৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬৭, ২/৮১ পৃঃ; ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/১৮৫ পৃঃ, 'মাসাহ করার বর্ণনা'।
১০৮. যঈফ আবূদাঊদ হা/১৪৭; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৫৬৪।
১০৯. পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা, পৃঃ ৪২ ও ৪৪।
১১০. ঐ, (ঢাকা: মুমতায লাইব্রেরী, ১১, বাংলাবাজার, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১০), পৃঃ ১১৪-১১৫।
১১১. তাবারাণী কবীর হা/১৭৫৮৪, ২২/৫০।
১১২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৯ ও ৭৪৪।
১১৩. আল-মাজমূ' শারহুল মুহযাব ১/৪৬৫ পৃঃ।
১১৪. তাবারাণী কবীর ১৯/১৮১।
১১৫. লিসানুল মীযান ৬/৪২ পৃঃ; তানক্বীহ, পৃঃ ৮৩।
১১৬. আবূদাঊদ হা/১৩২, ১/১৭-১৮ পৃঃ।
১১৭. وَمَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ حَتَّى أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ أُذُنَيْهِ. قَالَ مُسَدَّدٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى فَأَنْكَرَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ ابْنُ عُيَيْنَةَ زَعَمُوا كَانَ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ أَيْشِ هَذَا طَلْحَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ؟ -যঈফ আবূদাঊদ হা/১৩২-এর আলোচনা দ্রঃ।

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি জাল।[১১৮] ইমাম সুয়ূত্বী জাল হাদীছের গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[১১৯]

(৫) مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ لَمْ يَغِلَّ بِالأَغْلاَلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(পাঁচ) 'যে ব্যক্তি ওযূ করবে এবং ঘাড় মাসাহ করবে তাকে ক্বিয়ামতের দিন বেড়ী দ্বারা বেড়ী পরানো হবে না'।[১২০]

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা।[১২১] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী উক্ত বর্ণনাকে জাল বলেছেন।[১২২] উক্ত বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইবনু আমল আল-আনছারী ও মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে মুহাররম নামের দু'জন রাবী ত্রুটিপূর্ণ। মুহাদ্দিছগণ তাদেরকে দুর্বল বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[১২৩]

ঘাড় মাসাহ করা সম্পর্কে এ ধরনে মিথ্যা বর্ণনা আরো আছে। এর দ্বারা প্রতারিত হওয়া যাবে না। বরং ঘাড় মাসাহ করার অভ্যাস ছেড়ে দিতে হবে।

(২০) ওযূর পর অঙ্গ মুছতে নিষেধ করাঃ

ওযূ করার পর রুমাল, গামছা কিংবা কাপড় দ্বারা অঙ্গ মুছতে পারে। এটা ইচ্ছাধীন।[১২৪] যে বর্ণনায় অঙ্গ মুছতে নিষেধ করা হয়েছে তা জাল বা মিথ্যা।

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيْلِ بَعْدَ الْوَضُوْءِ وَلاَ أَبُوْ بَكْرٍ وَلاَ عُمَرُ وَلاَ عَلِيٌّ وَلاَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর, ওমর, আলী এবং ইবনু মাসঊদ (রাঃ) ওযূর পর রুমাল দিয়ে মুখ মুছতেন না।[১২৫]

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি জাল। এর সনদে সাঈদ বিন মাইসারা নামে একজন রাবী রয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইবনু হিব্বান তাকে জাল হাদীছের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন।[১২৬] উল্লেখ্য, উক্ত মর্মে যঈফ হাদীছও আছে।

(২১) হাত ধোয়ার সময় কনুই-এর উপরে আরো বেশী করে বাড়িয়ে ধৌত করাঃ

হাত ধৌত করতে হবে কুনই পর্যন্ত। এর বেশি নয়। আল্লাহ্র নির্দেশ এটাই *(সূরা মায়েদাহ ৬)*। হাদীছের শেষে ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করার যে বক্তব্য এসেছে তার উদ্দেশ্য অঙ্গ বাড়িয়ে ধৌত করা নয়; বরং ভালভাবে ওযূ সম্পাদন করা।[৬১]

(২২) চামড়ার মোজা ছাড়া মাসাহ করা যাবে না বলে ধারণা করাঃ উক্ত ধারণা সঠিক নয়। বরং যেকোন পবিত্র মোজার উপর মাসাহ করা যাবে।[৬২] হাদীছে কোন নির্দিষ্ট মোজার শর্তারোপ করা হয়নি।[৬৩]

---

১১৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৯, ১/১৬৮ পৃঃ।
১১৯. হাফেয জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী, আল-লাআলিল মাছনূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আহ, পৃঃ ২০৩, দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ ১/১৬৮ পৃঃ।
১২০. আবু নু'আইম, তারীখুল আছবাহান ২/১১৫ পৃঃ।
১২১. সিলসিলা যঈফাহ হা/৭৪৪, ২/১৬৭ পৃঃ।
১২২. আল-মাছনূ' ফী মা'রেফাতুল হাদীছিল মাওযূ', পৃঃ ৭৩, দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ ১/১৬৯ পৃঃ।
১২৩. সিলসিলা যঈফাহ ১/১৬৯ পৃঃ।
১২৪. বায়হাক্বী, সনদ হাসান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৪৬৮; আওনুল মা'বূদ ১/৪১৭-১৮ পৃঃ।
১২৫. ইবনু শাহীন, নাসিখুল হাদীছ ওয়া মানসূখাহু, পৃঃ ১৪৫, দ্রঃ যাকারিয়া বিন গুলামা ক্বাদের পাকিস্তানী, তানক্বীহুল কালাম ফিল আহাদীছিয যঈফাহ ফী মাসাইলিল আহকাম (বৈরুত: দারু ইবনে হাযম, ১৯৯৯/১৪২০), পৃঃ ৯৬।
১২৬. আওনুল মা'বূদ ১/২৮৭ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ১/২২০ পৃঃ; নাসিখুল হাদীছ ওয়া মানসূখাহু, পৃঃ ১৪৫।

৬১. لو صحت هذه الجملة لكانت نصا على استحباب إطالة الغرة و التحجيل لا على إطالة العضد -আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫২ নং-এর ভাষ্য দ্রঃ, উল্লেখ্য, উক্ত অংশটুকু সংযোজনের ক্ষেত্রে ত্রুটি সাব্যস্ত হয়েছে বলেও মুহাদ্দিছগণ উল্লেখ করেছেন। -দ্রষ্টব্য আহমাদ হা/৮৩৯৪; ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী হা/১৩৬-এর আলোচনা, 'ওযূর ফযীলত' অনুচ্ছেদ; ইরওয়াউল গালীল ১/১৩৩ পৃঃ।
৬২. ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৫৯; ছহীহ তিরমিযী হা/৯৯; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৮, ২/১৩২ পৃঃ।
৬৩. আলোচনা দ্রঃ ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউ ফাতাওয়া ১/২৬২ পৃঃ; আলবানী, আছ-ছামারুল মাস্তাত্বাব, পৃঃ ১৪-১৫।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

*রফীক আহমাদ**

এ পৃথিবীতে মানুষ পার্থিব জগতের উন্নয়নে বড় বড় বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে অনেক বড় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন বা করছেন। আল্লাহ্র শক্তির (বিকল্প) অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতিক শক্তি নিয়েও ব্যাপক গবেষণা চলছে বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানীদের মাঝে। বিশ্বের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এখন নতুন নতুন আবিষ্কারের দিকে। এসব আবিষ্কারে মানুষ আর আশ্চর্যবোধ করে না। মনে হয় এগুলো যেন একটা চিরাচরিত ব্যাপার বা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তা-বিবেচনা ও গবেষণার সুফল। কিন্তু এগুলোর গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও আধ্যাত্মিক অর্থ কি তাই? একটি সামান্য মোবাইল সেটের কার্যকারিতা বা ক্ষমতা নিয়ে আমরা চিন্তা করেছি কি? কম্পিউটার সারাবিশ্বে আজ প্রায় ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। কিন্তু এর সীমারেখা বা কার্যক্ষমতা কত ব্যাপক! অথচ এগুলো এখন সহজ ব্যবহার্য বস্তু হয়ে পড়েছে। কারণ আজকাল পাঁচ-সাত বছর বয়সের একটা বুদ্ধিমান শিশুও মোবাইলের ব্যবহার সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল। কম্পিউটার ও ভিডিও চিত্রের অদ্ভুত নৈপুণ্য সম্পর্কেও তারা অনেক অবগত, যা ষাট-সত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধরাও বুঝে না। শুধু এগুলোই নয়, আরও অসংখ্য বিষয়ে মানুষ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র শক্তির ও জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা বর্তমানে মহাকাশের অন্তর্ভুক্ত গ্রহ-উপগ্রহগুলোতে মনুষ্য বসবাসের উপযোগী পরিবেশের অনুসন্ধান করছেন। মহাশূন্যের নিকটতম চাঁদের দেশে বসবাস নিয়েও উন্নত দেশসমূহে চলছে বিপুল আলোড়ন। এসব আলোড়ন ও আন্দোলনে এখন আর কোন বিস্ময়ের নমুনা প্রতিফলিত হচ্ছে না। বরং অনেকের কাছেই যেন এগুলো স্বাভাবিক। ভাল কর্মপরিকল্পনার ক্ষেত্রে যেমন প্রকাশ্য বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপ মন্দ পরিকল্পনা তথা সন্ত্রাস, হত্যা, নির্যাতন, নিপীড়ন প্রভৃতিও দিন দিন বেড়েই চলেছে। এসব আল্লাহ বন্ধ করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলার নিকট এটা অতি সহজ। কারণ তিনি সকল শক্তির মালিক ও উৎস। বিশ্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাক্ষমতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

'বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন, অতঃপর আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান' *(আনকাবুত ২৯/২০)*।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান' *(নূর ২৪/৪৫)*।

আল্লাহ আরো বলেন, لِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. 'নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ে অবস্থিত সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহ্রই। তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান বা ক্ষমতাবান' *(মায়েদাহ ৫/১২০)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ 'আল্লাহ্র জন্যই হ'ল আসমান ও যমীনের বাদশাহী। আল্লাহই সর্ববিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী' *(আলে ইমরান ৩/১৮৯)*। মহান আল্লাহ বলেন, لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান' *(হাদীদ ৫৭/২)*।

মহান আল্লাহ বলেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক। তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখা বিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান' *(ফাতির ৩৫/১)*।

তিনি আরো বলেন, يُسَبِّحُ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান' *(তাগাবুন ৬৪/১)*।

মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ্র কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তিনি স্বয়ং শ্রেষ্ঠ, মহাজ্ঞানী, পরাক্রমশালী ও সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। উপরে বর্ণিত আয়াতগুলিতে তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে।

অবশ্য কিছু মানুষ আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্য কোন বস্তুকে পূজা করে, সম্মান-শ্রদ্ধা করে, মান্য করে এবং তাদের উদ্দেশ্যে অনেক কিছু উৎসর্গও করে। যে কাজগুলি করতে আল্লাহ তা'আলা পুরোপুরিভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ

* *শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।*

তা'আলা একমাত্র তাঁকেই উপাস্য হিসাবে মান্য করার জন্য বার বার আদেশ দিয়েছেন। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। অনেক মানুষ যাদেরকে আল্লাহ্র সমতুল্য জ্ঞানে সারাজীবন আনুগত্য করে, সত্যি সত্যি তাদের কোন ক্ষমতা নেই। সারা জীবনে তারা একটা মশা-মাছিও সৃষ্টি করতে পারেনি বা পারবে না। সুদূর অতীতে এসব দেবতা ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগূছ, ইয়াউক, নাসর, লাত, ওযযা প্রভৃতি নামে খ্যাত ছিল। এরা নিতান্তই শক্তিহীন ও অর্থহীন অবলম্বন মাত্র। এরা কারো জন্ম-মৃত্যুরও মালিক নয়, কোন কিছু সৃষ্টিতেও সক্ষম নয়। এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হ'ল, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনো একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন' *(হজ্জ ২২/৭৩-৭৪)*।

মহান আল্লাহ বলেন, أَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللهُ هُــوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. 'তারা কি আল্লাহ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক স্থির করেছে? আল্লাহই তো একমাত্র অভিভাবক। তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান' *(শূরা ৪২/৯)*। অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُــوَ الْعَزِيْــزُ الْحَكِــيْمُ. 'তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যা কিছুকে ডাকে, আল্লাহ তা জানেন। তিনি শক্তিশালী মহাজ্ঞানী' *(আনকাবুত ২৯/৪২)*।

এ দুনিয়ায় কিছু সংখ্যক মানুষ নিঃসন্তান, কিছু সংখ্যক শুধু পুত্র-সন্তানের অধিকারী এবং কিছু শুধু কন্যা সন্তানের জনক। এমতাবস্থায় নিঃসন্তানের জনক ঈমানদার হ'লে আল্লাহ্র দরবারে সন্তানের জন্য, পুত্র সন্তানের জনক কন্যার জন্য এবং কন্যা সন্তানের জনক পুত্র সন্তানের জন্য প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করে। কেউবা পীর-দরবেশ, ফকীরের শরণাপন্ন হয়। এ বিষয়ের সকল সঠিক সমাধানও সর্বশক্তি আল্লাহ্র হাতেই রয়েছে। তিনি বলেন, 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান' *(শূরা ৪২/৪৯-৫০)*।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম জ্ঞানের দ্বারা, সকল প্রাণী ও প্রাকৃতিক বস্তুগুলিরও স্রষ্টা এবং এসবের জন্ম-মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'তাঁর একটি (উল্লেখযোগ্য) নিদর্শন এই যে, আপনি ভূমিকে দেখবেন অনুর্বর পড়ে আছে। অতঃপর আমি যখন তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন সে শস্য-শ্যামল ও উর্বর হয়। নিশ্চয়ই তিনি একে জীবিত করেন, তিনি জীবিত করবেন মৃতদেরকেও। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু করতে সক্ষম' *(হা-মীম সাজদা ৪১/৩৯)*।

একই মর্মার্থে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনি আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর আপনি দেখতে পান তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা পৌঁছান, তখন তারা আনন্দিত হয়। তারা প্রথম থেকেই তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পূর্বে নিরাশ ছিল। অতএব আল্লাহ্র রহমতের ফল দেখে নাও, কিভাবে তিনি মৃত্তিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান' *(রূম ৩০/৪৮-৫০)*।

মানুষকে এ বিষয়ে আরও অধিক জ্ঞান দানের প্রয়াসে মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন, 'তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি। অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল-সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়, অতঃপর তা এমন শুষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ এসব কিছুর উপর শক্তিমান। ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎ কর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্য উত্তম। যেদিন (ক্বিয়ামতের দিন) আমি পর্বত সমূহকে পরিচালনা করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একত্রিত করব, অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না' *(কাহফ ১৮/৪৫-৪৭)*।

আল্লাহ্র মহাশক্তি বা অসীম শক্তির বর্ণনায় উপরের আয়াতগুলোর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। মহাজ্ঞানবান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র জ্ঞানের তুলনায় মানুষের জ্ঞান যে কত স্বল্প তা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। পবিত্র কুরআনে তিনি তাঁর মহাজ্ঞানের কথা সহজ ভাষায় উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّــا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُــوْنَ. 'আমার কাছে রক্ষিত এই আমলনামা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা

যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম' *(জাছিয়া ৪৫/২৯)*।

অন্য আয়াতে তিনি বলেন, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. 'আমি সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছি' *(নাবা ৭৮/২৯)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِيْ إِمَامٍ مُبِيْنٍ. 'আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি' *(ইয়াসীন ৩৬/১২)*। আল্লাহ আরো বলেন, فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُوْنَ. 'অতঃপর যে বিশ্বাসী অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, তার প্রচেষ্টা অস্বীকৃত হবে না এবং আমি তা লিপিবদ্ধ করে রাখি' *(আম্বিয়া ২১/৯৪)*। সর্ববিষয়ে আল্লাহ তা'আলা অতি নিখুঁতভাবে মানুষের কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করছেন। শুধু বাহ্যিক বা প্রকাশ্য কথাবার্তাই নয় অন্তরের গোপন চিন্তা বা কল্পনার ভাল ও মন্দ বিষয়গুলিও তিনি অবগত হন। এসব অসম্ভব তথ্যপ্রবাহে যে মহাজ্ঞান, মহাশক্তি, ও সর্ববিষয়ের সর্বশক্তির সীমাহীন ভাবার্থ নিহিত রয়েছে তা যেকোন ব্যক্তির জন্য সর্বান্তকরণে গভীর শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করা উচিত। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ. 'আমি মানুষ সৃষ্টি করছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী' *(ক্বাফ ৫০/১৬)*।

আল্লাহ আরও বলেন, وَأَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوْا بِهِ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ 'তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত' *(মুলক ৬৭/১৩)*। মানুষকে অত্যধিক সতর্ক করার প্রয়াসে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ 'চোখের চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন' *(মুমিন ৪০/১৯)*। অপর এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তায় অন্তর্যামী আল্লাহ বলেন, ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ 'অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও অবগত' *(যুমার ৩৯/৭)*।

মহান আল্লাহ বলেন, وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُم مَّنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ. 'আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যুদান করেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌঁছে যায় জরাগ্রস্ত অকর্মণ্য বয়সে, ফলে যা কিছু তারা জানত সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিজ্ঞ সর্বশক্তিমান' *(নাহল ১৬/৭০)*।

অন্যত্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন, 'হে লোকসকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্যে। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি, যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। এগুলো একারণে যে আল্লাহ সত্য এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(হজ্জ ২২/৫-৬)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'তারা কি জানে না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম। কেন নয়, নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান' *(আহকাফ ৪৫/৩৩)*।

এ বিষয়ে তিনি আরও বলেন, إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ– 'আল্লাহ্র সান্নিধ্যেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান' *(হূদ ১১/৪)*।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাশক্তি, মহাজ্ঞান ও যাবতীয় তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষমতার বিষয়টি জগদ্বাসীকে অবহিত করতেই এসব অবতীর্ণ করেন। এতে ধনী-দরিদ্র, শক্তিশালী-দুর্বল, অল্পজ্ঞানী-অধিক জ্ঞানী, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সবার জন্যে একই রূপ শিক্ষা, জ্ঞান ও উপদেশ লুক্কায়িত আছে। অন্যত্র তিনি ঘোষণা করেন, 'বলুন, হে আল্লাহ! আপনিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন

এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নেন এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। আপনার হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আপনি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের ভেতরে। আর আপনিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আনেন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের করেন। আর আপনিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন। মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহ্র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা করলে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে সতর্ক করেছেন তোমাদেরকে এবং সবাইকে। তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। বলুন! তোমরা যদি মনের কথা গোপন করে রাখ অথবা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ সে সবই জানতে পারেন। আর আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সেসবও তিনি জানেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান' *(আলে ইমরান ৩/২৬-২৯)*।

পৃথিবীর মানুষ যদি উপরোল্লেখিত মাত্র কয়েকটি আয়াত নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করে, মনোযোগ সহকারে গবেষণা করে, তবে এগুলোকে স্পষ্ট দিবালোকের ন্যায় স্বচ্ছ ও সুন্দরভাবে দেখতে পাবে, অনুভব করতে পারবে এবং সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে চলে যাবে। তখন আল্লাহকে সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ভাবতে বা মান্য করতে আরও অনেক সহজ হবে। কারণ পৃথিবীর বুকে বড় বড় রাজা-বাদশাহ, সম্রাট, প্রেসিডেন্ট তাদের শাসনকার্য, দিগ্বিজয় ও তাদের শেষ পরিণতির যে ইতিহাস রেখে গেছেন, তা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। ঐসব শক্তিশালী নরপতিদের অধিকাংশেরই উচ্ছাকাংখা বা স্বেচ্ছাচারিতা পূর্ণ হয়নি। বরং আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাদের ভাগ্যে ঘটেছে লজ্জাজনক ও কষ্টদায়ক মর্মান্তিক পরিণতি। আবার তাদের অনেকের ভাগ্যে তাদের ন্যায়পরায়ণতা ও সুশাসনের সুফলও রয়েছে। তাদের কাহিনীও কুরআনে লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন ন্যায়পরায়ণ, সুশাসক ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির বাহক হিসাবে দাউদ (আঃ), সোলায়মান (আঃ), বাদশাহ তালূত, যুলকারনাইন প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপর দিকে দুরাচার ফেরআউন, নমরূদ, আবরাহা, জালূত প্রমুখ স্বৈরাচারী সম্রাটদের দুঃসাশন ও কুশাসনের নির্মম ও নিপীড়ণের চিত্রও কুরআনের পাতায় স্থান লাভ করেছে। পবিত্র কুরআনের এসব বাস্তব ঘটনা সর্বশক্তিশান ও মহাজ্ঞানবান আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে।

জীবন-মৃত্যু সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'পুণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব, তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন। যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল' *(মুলক ৬৭/১-২)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, 'আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা ও তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক। আকাশ ও পৃথিবীর চাবিও তাঁরই কাছে' *(যুমার ৩৯/৬২-৬৩)*।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনিই আসমান ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে' *(হূদ ১১/৭)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً– 'আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্যে শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে' *(কাহফ ১৮/৭)*।

অতঃপর মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ– 'আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫৯/৫৬)*।

মূলতঃ নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডল, দৃশ্য-অদৃশ্য এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত অগণনীয় বস্তুর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাজ্ঞানের এক সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন। এ চিত্রের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে আমরা রয়েছি। আর এসব সম্বন্ধে আমাদের যৎসামান্য ধারণা আছে মাত্র। যেমন আমাদের মাথার উপর মহাকাশ এবং সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, ছায়াপথ প্রভৃতি। এগুলির সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ– 'মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি কঠিনতর। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না' *(মুমিন ৪০/৫৭)*।

এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন, أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا– 'তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন' *(নাযি'আত ৭৯/২৭)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলির বর্ণনায় জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের চেয়ে জড়শ্রেষ্ঠ আকাশের সৃষ্টিকে কঠিন বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ্র এই বক্তব্যের মধ্যে গভীর জ্ঞানের বিষয় লুক্কায়িত আছে। আমরা মহাকাশের রহস্যপূর্ণ অবস্থান লক্ষ্য করে

একটু গভীর চিন্তা করলে এবং মানব সৃষ্টির উপাদানগুলি একটু ব্যাখ্যা করলেই অনেকটা বুঝতে পারব। মানব তৈরী গগনস্পর্শী বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাগুলির ভিত্তি ও ছাদে ব্যবহৃত উপাদান কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উচ্চ প্রযুক্তি দ্বারা নির্ণয় করা হয়, তা সাধারণ মানুষের জ্ঞানের ঊর্ধ্বে। অবশ্য সেগুলিতে অতি শক্তিশালী স্তম্ভ দ্বারা ছাদকে ও ছাদের উপাদানসমূহকে ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। আর আকাশের সৃষ্টি তো আরও অত্যাশ্চর্য। আকাশ তো মহাশূন্যের বহু ঊর্ধ্বে নির্মিত একটি শক্তিশালী ছাদ। এত বিপুলায়তনের ছাদ একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র পক্ষেই নির্মাণ করা সম্ভব। কিন্তু যত বড় বস্তুই নির্মাণ করা হোক, তার জন্যে উপাদানের প্রয়োজন হবে। মানুষ তৈরী করতেও অনেক উপাদান ও মহামূল্যবান জ্ঞানের প্রয়োজন হয়েছে। এগুলি সম্পর্কে আমরা এখন কিছুটা ওয়াকিফহাল। কিন্তু আকাশ নির্মাণের উপাদান, তা সংযোজনের চিন্তা বা কল্পনা করাও মানব জাতির পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষে সহজ। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। উপরের আয়াতগুলি তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

আলোচনার শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ বলেছেন, 'মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি কঠিনতর'। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির উপাদান ও প্রযুক্তির চেয়ে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি উপাদান ও প্রযুক্তি কঠিনতর, তাই তাদের সৃষ্টিও কঠিন। তার অর্থ এই নয় যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি আল্লাহ্র পক্ষে কঠিন। শুধু মানবজাতিকে আল্লাহ্র মহাশক্তি সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের নিমিত্তেই এ ধরনের তাৎপর্যপূর্ণ আয়াতের অবতারণা।

আসলে মানুষ সৃষ্টি তো আল্লাহ্র একটি সুবিজ্ঞ পরিকল্পনা। আর মানুষের সরল পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্যে শয়তানের উদ্ভবও একটি রহস্যজনক পরিকল্পনা। যাহোক শয়তানের আবির্ভাব ও মানুষের উপর তার প্রাথমিক বিজয় কাহিনী সহ শত্রুতার অভিযান সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে অবহিত করেছেন। অতঃপর পৃথিবীর বুকে শয়তানের ঘৃণ্য কাজগুলি হ'তে বেঁচে থেকে আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে চলার জন্যেই আহ্বান জানিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। কারণ তিনি পৃথিবীকে মানুষের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র হিসাবে স্থাপন করেছেন। আর এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তিনি মানব জাতির ইবাদতের ব্যবস্থা করেছেন। একই সঙ্গে ইবাদতে বাধা সৃষ্টির জন্য শয়তানকেও স্বাধীনতা দিয়েছেন।

মানুষকে তার শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর দ্বারা, অধম শয়তানের অদৃশ্য দোষসমূহের মোকাবিলা করাই ইবাদতের প্রাথমিক ও প্রধান কাজ। শয়তানের কাজ হ'ল মানুষের গুণাবলীকে নষ্ট করে দিয়ে নিজের দোষগুলি তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া। আর মানুষের কাজ হ'ল শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করে নিজ গুণে মানুষ হিসাবে টিকে থাকা। যারা শয়তানকে পরাস্ত করে মানুষ হিসাবে টিকে থাকবে তারাই আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের দলভুক্ত হবে। আর যারা শয়তানের কাছে পরাস্ত হয়ে তার পরামর্শ ও পসন্দনীয় কাজ করবে তারা শয়তানের দলভুক্ত হয়ে যাবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা উভয় দলের কার্যাবলীর হিসাব নিবেন। অতঃপর অপরাধীদের শাস্তি দিবেন এবং সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করবেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'যা কিছু আসমান সমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে, সব আল্লাহ্র। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নিবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান' *(বাক্বারাহ ২/২৮৪)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতঃপর সীমালংঘনের পর যে তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ্র নিমিত্তেই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান' *(মায়েদাহ ৫/৩৯-৪০)*। 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান' এ বাণীর অর্থ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হ'তে তাঁকেই একমাত্র নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে পাওয়া যায়। তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

পৃথিবীর রাজা-বাদশাহ, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীগণ তাদের রাজ্য পরিচালনা করতে বেশ কিছু সংখ্যক মন্ত্রী নিয়োগ দিয়ে থাকেন। আমাদের বাংলাদেশের মত একটা ছোট দেশেও ৩০/৩৫ জন মন্ত্রীর দরকার হয়। তাছাড়া বড় বড় কর্মকর্তাদের সংখ্যা তো আরো অনেক। এভাবে সমগ্র বিশ্ব প্রায় লক্ষ লক্ষ মন্ত্রী এবং কোটি কোটি বড় বড় কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম ও অনন্ত রাজত্বের অগণনীয় মানুষের অসংখ্য ধর্মের, বিভিন্ন মতাবলম্বীর, অগণনীয় ভাল-মন্দ কাজের, সত্যের সুফল, মন্দের শাস্তি, ন্যায়ের পুরস্কার, অন্যায়ের তিরস্কার, সুবিচারের প্রতিদান, অবিচারের প্রতিফল, বিশ্বাসের মহাপুরস্কার, অবিশ্বাসের কঠোর শাস্তি, বিবেকবানদের জন্য ক্ষমা ও সহানুভূতি, বিবেকহীনদের জন্য বিমুখতা ও নিষ্ঠুরতা, পুণ্যবানদের জন্য জান্নাত এবং পাপীদের জন্য জাহান্নাম লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। ক্বিয়ামতের দিন তিনি একাকী সমস্ত মানুষের হিসাব নিবেন এবং বিচার করবেন, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এজন্যেই পবিত্র কুরআনে বার বার ঘোষিত হয়েছে, 'আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গ্লোবাল টাইগার সামিট

জাহাঙ্গীর হোসেন

২১ নভেম্বর ২০১০ রাশিয়ায় ব্যাপক প্রচার-প্রচারণায় শুরু হ'ল 'গ্লোবাল বাঘ সামিট'। বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসাবে খোদ প্রধানমন্ত্রী সেখানে গিয়েছেন, আমাদের অহংবোধের একমাত্র আন্তর্জাতিক প্রাণী 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' বিষয়ে সারগর্ভ কথাবার্তা বলার জন্য। মূলতঃ বিলুপ্তপ্রায় বাঘকে কিভাবে বাঁচানো যায় এবং ২০২২ সালের মধ্যে এর সংখ্যা দ্বিগুণ তথা ভালভাবে বাঁচানোর কৌশলপত্র তৈরী করাই এ সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য। মাসখানেক আগে বহুল প্রচারিত একটি দৈনিকের রিপোর্টে সুন্দরবনের আশপাশে বাঘের আক্রমণে মানুষ হত্যার চিত্র ছিল নিম্নরূপ :

'...২০০০ সালে বাঘের আক্রমণে মানুষ মারা যায় ৩০ জন, ২০০১ সালে ১৯, ২০০২ সালে ২৮, ২০০৪ সালে ১৫, ২০০৫ সালে ১৩, ২০০৬ সালে ৬, ২০০৭ সালে ১০, ২০০৮ সালে ২১, ২০০৯ সালে ৩০, ২০১০ সালে (আগষ্ট পর্যন্ত) ৩০ জন। ভারতীয় প্রাণী বিজ্ঞানীদের মতে, বন নিরাপদ বান্ধব না হওয়ার কারণে এবং মানুষের গোশত মিষ্টি হওয়ায় বাঘ লোকালয়ে আসছে এবং বাঘের হাতে মানুষের মৃত্যুর খবর প্রতিনিয়ত বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশ ও ভারতের এ অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাসে হাযার হাযার মানুষ মারা যায়। আর স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া এসব গলিত মৃতদেহ বাঘ খায়। ফলে তারা মানুষখেকো বাঘে পরিণত হচ্ছে।

এখন টিভি চ্যানেলের 'ব্রেকিং নিউজে' কিংবা পত্রিকার পাতায় প্রায়ই চোখে পড়ে, 'সুন্দরবনে মধু বা গোলপাতা কিংবা শুকনো কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে 'অমুক-অমুক' বাঘের আক্রমণে নিহত'। অনেকটা রাস্তার 'রোড-এক্সিডেন্টে'র মত। আসলে প্রতি বছর 'আমাদের তথাকথিত অহংকার' সুন্দরবনের বাঘ-এর আক্রমণে আমাদের কত মাওয়ালী, বাওয়ালী, জেলে ও নিরীহ গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়, তার সঠিক পরিসংখ্যান আমরা না রাখলেও, সুন্দরবনে কতটি বাঘ আছে, তার মধ্যে পুরুষ, মহিলা ও শিশু বাঘ ক'টি ইত্যাদির সব তথ্য সংগ্রহে আমরা অত্যন্ত ব্যাকুল। সর্বশেষ জরিপ মতে, এদেশে বর্তমানে বাঘের সংখ্যা ৪১৯টি, যার মধ্যে পুরুষ বাঘ ১২১ ও মহিলা ২৯৮টি। বাংলাদেশের মানুষেরও এত সঠিক হিসাব আছে কিনা আমার সন্দেহ! 'সেন্ট পিটার্সবার্গ' সম্মেলনের আগে এদেশে মহা উৎসাহে চমৎকার ব্যানার-পোষ্টারে পালন করা হ'ল 'বাঘ-দিবস'।

বিশ্বের মাত্র ১৩টি দেশে বাঘ বাস করে, তার মধ্যে বাংলাদেশ একটি। অন্য দেশগুলো হচ্ছে- ভারত, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, ভুটান, নেপাল ও রাশিয়া।

আকজাল টিভি চ্যানেলগুলো খুললেই আফ্রিকার হিংস্র সিংহ-বাঘ কর্তৃক জেব্রা, ওয়াইলবিস্ট, মহিষ ইত্যাদিকে ঝাপটে ধরে কিভাবে মহা উল্লাসে হত্যা করা হয়, তা দেখে আমাদের হৃদয় অনেকেরই কেঁদে ওঠে। কিন্তু এদেশের হাযারো 'নুন আনতে পান্তা ফুরানো' টাইপের 'ছলিমদ্দি-কলিমদ্দি'দের কিভাবে বাঘে টেনে নিয়ে হত্যার পর, তাদের অসহায় পরিবারবর্গ কিভাবে আবার নতুন জীবন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তা অদ্যাবধি এদেশের কিংবা ঐ দেশীয় বহুজাতিক চ্যানেলগুলো সম্ভবত এ জন্যে দেখায় না যে, এদেশের মানুষ তখন তার স্বজনদের যে কোন ভাবে রক্ষায় এগিয়ে আসবে এবং স্বজনখেকো বন্য বাঘকে এভাবে তথাকথিত 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশের' মাধ্যমে রক্ষার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। আমাদের অহংবোধের প্রাণী বাঘ আমাদের কি কি উপকার করছে ও ক্ষতির পরিমাণই বা কি? আমরা যদি আবেগের বশবর্তী না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করি তাহ'লে দেখতে পাবো, বাঘ প্রতিবছর আমাদের কত মানুষকে হত্যা করছে। তা ছাড়াও বাঘ তার নিজ সন্তান হত্যা ছাড়াও প্রতিবছর আমাদের কত হরিণ, বন মোরগ, অন্য বন্য ও গৃহপালিত প্রাণী খেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে, তার পরিসংখ্যান কিন্তু কেউ করছে না। বাঘে সুন্দরবনের হরিণ না খেলে, আমাদের হরিণের সংখ্যা অনেক বেশী হ'ত নাকি? তাতে আমাদের কি ক্ষতি হ'ত? কয়েক বছর আগে 'বাঘমুক্ত' নিঝুম দ্বীপে মাত্র কয়েক জোড়া হরিণ ছাড়া হ'লেও, বর্তমানে ঈর্ষণীয়ভাবে ঐ দ্বীপে হরিণের সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং সরকার ঐ দ্বীপের হরিণ রফতানী বা জনসাধরণের কাছে বিক্রির চিন্তা করছে বলে পত্রিকার রিপোর্টে বেরিয়েছে। নিঝুম দ্বীপে কেবল হরিণ আছে বাঘ নেই, তাতে নিঝুম দ্বীপবাসী ও সেখানে বসবাসকারী হরিণ কারোই কোন সমস্যা হচ্ছে না। হরিণের সংখ্যা ঈর্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। আর এই বাঘ রক্ষার জন্যে কত সরকারী অফিস, প্রকল্প, প্রচার-প্রচারণা, পোষ্টার-ব্যানার, সভা-সেমিনার তার হিসাব আমার মত সাধারণ মানুষের পক্ষে দেয়াও অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য, এদেশের অসহায় 'রাম-রহিম'দের বর্ণিত বাঘ থেকে রক্ষার কোন প্রকল্প বা বরাদ্দ কিংবা মরণোত্তর পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের কোন ব্যবস্থা আমরা করেছি কি?

তাহ'লে পুরো ব্যাপারটিই হচ্ছে আমাদের তথাকথিত আবেগঘন 'আভিজাত্য' তথা খামোখা অসহায় মানুষের জীবনের সাথে এক ধরনের 'প্রতারণার নামে প্রচারণা', যা ত্যাগ করাই আমাদের জন্য সবদিক দিয়ে শ্রেয়। আমাদের পরিবেশবাদী ও এই কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিগণকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাব, আমাদের দেশের মাটি ও মানুষের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য, অন্য দেশের তথাকথিত 'আমাদের মানুষের জন্য কল্যাণহীন' আইনের পক্ষে নয়। এ ক্ষেত্রে আবেগের চেয়ে মানবিকতা ও যুক্তির প্রাধান্য অত্যাবশ্যক।

হাইকোর্টের রায় এবং পার্বত্যচুক্তির ভবিষ্যৎ

সৈয়দ ইবনে রহমত

বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যকার স্বাক্ষরিত চুক্তির বয়স তের পেরিয়ে আজ চৌদ্দ বছরে পদার্পণ করেছে। এই দীর্ঘ সময় পরেও চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য রয়ে গেছে। বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে মাঝখানে চুক্তিবিরোধী বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসায় এটি পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। কিন্তু তারা দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর চুক্তির উল্লেখযোগ্য প্রায় সকল ধারাই বাস্তবায়ন করছে। অবশিষ্ট ধারাসমূহও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অপরপক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে হরহামেশাই বলতে শুনা যাচ্ছে যে, চুক্তির মৌলিক ধারাসমূহের কোনটাই বাস্তবায়ন করছে না সরকার। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে কাঙ্ক্ষিত শান্তিও আসছে না। তাই প্রতিবারই চুক্তির বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে চুক্তি বাস্তবায়নের ধীরগতি এবং সরকারের অবহেলার বিবরণ সম্বলিত সাময়িকী প্রকাশসহ সভা-সেমিনার, মিছিল-মিটিং করে প্রতিবাদ জানানো রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারো তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। অথচ ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর চুক্তি স্বাক্ষরের পর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার প্রায় সাড়ে তিন বছর ক্ষমতায় থেকে বিদায় নেয়ার সময় ঘোষণা করেছিল যে, তারা চুক্তির ৯৮ শতাংশ বাস্তবায়ন করেছে। ২০০১ সালে অর্থাৎ সাড়ে তিন বছরে যে চুক্তির ৯৮ শতাংশ বাস্তবায়ন করা হয়েছিল সে চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে ১৩ বছর পরেও কেন পক্ষদ্বয় একমত হ'তে পারছে না বরং পরস্পর কাদা ছোঁড়াছুড়িতে ব্যস্ত তা নিয়ে জনমনে কৌতুহল তৈরী হওয়াটাই স্বাভাবিক। হয়েছেও তাই।

সচেতন নাগরিক সমাজের কাছে শুরু থেকেই পার্বত্য চুক্তি সংবিধান বিরোধী এবং দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার মূলে কুঠারাঘাত হিসাবে চিহ্নিত হ'লেও আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগীরা এর বিরোধিতা করে একে সংবিধান ও দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি আস্থা রেখেই প্রণীত শান্তিচুক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করে প্রচারণা চালিয়ে আসছিল। কিন্তু সম্প্রতি রিট আবেদন নম্বর ২৬৬৯/২০০০ এবং ৬৪৫১/২০০৭-এর প্রেক্ষিতে দেয়া হাইকোর্টের রায়ে আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগীদের প্রচারণার অসাড়তা প্রমাণিত হয়েছে। হাইকোর্টের রায়ে পার্বত্যচুক্তি এবং এ চুক্তির নির্দেশনা মোতাবেক প্রণীত আইনসমূহ ও গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। এর মধ্যে হাইকোর্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনকে বেআইনি ও অবৈধ ঘোষণা করেছে। মামলাটি বর্তমানে সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগে বিবেচনাধীন থাকায় এখনই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সম্পর্কে ধারণা করা না গেলেও হাইকোর্টের রায় থেকে চুক্তি এবং চুক্তির ফলে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ আইনসমূহ, আঞ্চলিক পরিষদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একই সাথে এটাও বুঝা যায় যে, সরকার বারবার চুক্তি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেও কেন তা বাস্তবায়ন করতে পারছে না। তাছাড়া সরকার এবং জনসংহতি সমিতির মতপার্থক্য কেন কমিয়ে আনা যাচ্ছে না তাও স্পষ্ট হয়েছে।

উল্লেখ্য, পৃথক দু'টি মামলার রুলের চূড়ান্ত শুনানি গ্রহণ করে বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ ও বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীকে নিয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ চলতি বছরের ১২ ও ১৩ এপ্রিল দুই দিনব্যাপী এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেন। এই রায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পর্কে মন্তব্যে আদালত বলেন, বহু-বৈচিত্র্যময় শান্তিচুক্তিটি সংবিধানের অধীন বর্ণিত চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। দীর্ঘদিন ধরে চলমান শান্তি প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট এই আন্তঃরাষ্ট্রীয় শান্তিচুক্তিটি মূলতঃ সংবিধান সংশ্লিষ্ট নয় এবং সাংবিধানিক বিবেচনার বাইরে থেকেই এর প্রকৃতি ও বৈধতা নির্ধারণ করতে হবে। তাছাড়া শান্তিচুক্তি স্বাভাবিক কার্যকারিতা হারিয়েছে। কারণ, এই চুক্তিটি পরবর্তীকালে ৪টি আইনে পরিবর্তিত হয়েছে। এ কারণে শান্তিচুক্তির বৈধতার প্রশ্নে আদালতের কিছু বিবেচনার প্রয়োজন নেই। কারণ শান্তিচুক্তির শর্তগুলো উক্ত ৪টি আইনের মাধ্যমে কার্যকর হয়েছে। ফলে আদালত শান্তিচুক্তির পরিবর্তে চুক্তির শর্ত মোতাবেক প্রণীত আইনগুলো সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করে রায় প্রদান করেন।

আঞ্চলিক পরিষদ আইন সম্পর্কে আদালতের বক্তব্য হচ্ছে, আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ধারা ৪১-এর মাধ্যমে আইন প্রণেতাদের ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেয়ার উদ্দেশ্যকেই প্রকাশ করে। রাষ্ট্রের একক স্বত্বাকে খর্ব করার উদ্দেশ্যেই আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ধারা ৪০ এবং ৪১ ইচ্ছাকৃতভাবেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও আঞ্চলিক পরিষদ আইন সংবিধানের ১ নম্বর অনুচ্ছেদে রক্ষিত রাষ্ট্রের একক চরিত্র হিসাবে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করেছে। বাদি এবং বিবাদি পক্ষের যুক্তিতর্ক ও সংবিধানের ৮ম সংশোধনী মামলার মতামত ও পর্যবেক্ষণ থেকে আদালত সিদ্ধান্তে আসে যে, আঞ্চলিক পরিষদ আইনটি রাষ্ট্রের একক চরিত্র ধ্বংস করেছে বিধায় এটি অসাংবিধানিক। এ ছাড়াও সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ মোতাবেক এই আঞ্চলিক পরিষদ কোন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নয়। এর কারণ হচ্ছে যে, পরিষদ আইনে আঞ্চলিক পরিষদকে প্রশাসনিক কোনো ইউনিট হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়নি।

হাইকোর্টের রায়ে আঞ্চলিক পরিষদ আইন এবং আঞ্চলিক পরিষদকে অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণার পাশাপাশি পার্বত্য

তিনটি যেলা পরিষদ আইনের বেশ কিছু ধারাকে বেআইনি ও অবৈধ ঘোষণা করেছে।

আদালত যেলা পরিষদ আইনের ৬ নম্বর ধারা বিবেচনা করে উল্লেখ করেন, ঐ ধারায় একজন ব্যক্তি উপজাতীয় কি না, তা গ্রামের হেডম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সনদের দ্বারা নির্ধারিত হবে বলে সার্কেল চিফকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। বস্তুতঃ এই বিধান এমন কোন বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ড নিশ্চিত করেনি যার দ্বারা ঐ সনদ প্রদান করা হবে কি না, তা নিশ্চিত করা যায়। তাই এটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮(১), ২৯(১) এবং ৩১-এর বিধানগুলোর লঙ্ঘন। সংবিধানের একই বিধানগুলো দ্বারা ১৯৮৯ সালের আইনের ১১ নম্বর ধারা (যা ১৯৯৮ সালের আইনের ১১ নম্বর ধারার সংশোধিত)- যার বিধান অনুযায়ী 'স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচনে ভোট প্রদান করতে হ'লে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই পাহাড়ি অঞ্চলে জমির অধিকারী এবং ঐ এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হ'তে হবে কে বাতিল করে। আদালত মনে করেন যে, ওই ধারা বাস্তবিকভাবে একজন অ-উপজাতীয় ব্যক্তিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যেকোন নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত করছে যদিও বাংলাদেশ সংবিধানে সেই অধিকারগুলো রক্ষিত আছে। আদালত আরো উল্লেখ করেন যে, ১৯৮৯ সালের আইনের ধারা ৩২(২) এবং ৬২(১) (যা ১৯৯৮ সালের আইনের সংশোধিত) এর দ্বারা পার্বত্য যেলা পরিষদ এবং পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নীতির বিধান পূর্ববর্তী আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নিয়োগ নীতির পরিবর্তে আনা হয়েছে।

কোন ব্যক্তি কিভাবে এবং কিসের ওপর ভিত্তি করে অন্য ব্যক্তির অধিকারকে লঙ্ঘন করে এবং তাকে বাদ দিয়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়োগের সুবিধা পাবে, এই আইনে সে বিষয়ে কিছুই উল্লেখ নেই। তাই আদালত মনে করেন যে, এই বিধানগুলো সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮ (১), ২৯ (১) এবং (২) এর পরিপন্থী। এই পরিপ্রেক্ষিতে বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ডের অনুপস্থিতিতে এবং বর্ণ বৈষম্যের ওপর ভিত্তি করে অগ্রাধিকার নীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা অসাংবিধানিক।

অপরদিকে আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও আঞ্চলিক পরিষদকে বেআইনি ও অবৈধ এবং পার্বত্য যেলা পরিষদ আইনসমূহের বিভিন্ন বিতর্কিত ধারা বাতিল করে হাইকোর্টের রায় পেশ করার দিনই আদালত প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে অতিরিক্ত এটর্নি জেনারেল এডভোকেট মুরাদ রেজা জানিয়েছিলেন যে, রায় ঘোষণার পর এর বিরুদ্ধে আপিল না করা পর্যন্ত আঞ্চলিক পরিষদের কোন অস্তিত্ব নেই।

আর এ কারণেই সরকার দ্রুত সুপ্রীম কোর্টে আপিল করে আঞ্চলিক পরিষদ এবং সন্তু লারমার পদ আপাতত রক্ষা করেছে। যাইহোক দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিবেচনায় থাকায় মামলার চূড়ান্ত ফল সম্পর্কে জানতে হ'লে সংশ্লিষ্টদের আরো অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু আপিল বিভাগের রায় কি হ'তে পারে সে সম্পর্কে সরকার এবং জনসংহতি সমিতি হাইকোর্টের রায় থেকেই সম্ভবত কিছুটা আঁচ করতে পারছে। তাই তারা বিকল্প পথ খুঁজছে। সরকারের পক্ষ থেকে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে, প্রয়োজনে চুক্তিকে সাংবিধানিক সুরক্ষা দিয়ে হ'লেও (আদালতের ভাষায় রাষ্ট্রের একক চরিত্র ধ্বংসকারী) আঞ্চলিক পরিষদ আইন এবং আঞ্চলিক পরিষদকে রক্ষা করা হবে। অপর দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি এবং আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তু লারমা পার্বত্যাঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য বারবার সরকারকে তাগিদ দিচ্ছে। তাদের সাথে যুক্ত হয়েছে বামদলীয় তথাকথিত সুশীল সমাজ এবং সবার পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইউএনডিপিসহ বেশ কিছু দেশী-বিদেশী এনজিও। তবে এখানে বলে রাখা ভাল যে, যারা আদালতকে পাশকাটিয়ে অসাংবিধানিক পার্বত্যচুক্তি এবং আঞ্চলিক পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনকে সুরক্ষা দিতে চান তাদেরকে সংবিধানের ৮ম সংশোধনী মামলা এবং ৫ম সংশোধনী মামলার রায় থেকে শিক্ষা নেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় এক্ষেত্রেও ভবিষ্যতে একই পরিণতি হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। তাছাড়া এটি ভবিষ্যতে গর্হিত অপরাধ হিসাবেই গণ্য হবে।

অতএব সরকার এবং জনসংহতি সমিতিকে নতুন করে ভাবতে হবে। তাদের ভাবনায় দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংবিধানের সুরক্ষাই অগ্রাধিকার পেতে হবে। তা না হ'লে পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসরত সকল জনগোষ্ঠীর অধিকার সমুন্নত রেখে শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কোনদিনই বাস্তবায়িত হবে না। আর এই পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হ'লে অশান্ত পরিবেশের সুযোগ নিবে সুযোগসন্ধানী বিদেশী অপশক্তিগুলো। ইতিমধ্যেই তার প্রভাব পার্বত্যাঞ্চলে বিদ্যমান। পাহাড়ে অশান্তি এবং অর্থনৈতিক দুরাবস্থার সুযোগ নিয়ে সেখানে বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠীর সহায়তায় দুর্বার গতিতে চলছে খ্রিষ্টানাইজেশন। কোন কোন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর শতভাব মানুষ খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর লোকজনও একই স্রোতের আবর্তে হারিয়ে ফেলছে তাদের নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি। এ খ্রিষ্টানাইজেশন আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোর কৃষ্টি-কালচার সবকিছুই ধ্বংস করে দিচ্ছে। অথচ এক সময় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীগুলো তাদের এই সংস্কৃতি রক্ষার জন্যই সশস্ত্র সংগ্রামে নেমেছিল।

তাই তের বছর পর একটি অসাংবিধানিক বিষয়কে নিয়ে টানাহেঁচড়া না করে সরকার এবং জনসংহতি সমিতি পার্বত্যাঞ্চলের সকল নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হবে এটাই প্রত্যাশা।

॥ সংকলিত ॥

মহিলাদের পাতা

বিশ্ব ভালবাসা দিবস

*নূরজাহান বিনতে আব্দুল মজীদ (রুকু)**

'ভালবাসা'[১২৭] দিবস'কে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবী দিন দিন উন্মাতাল হয়ে উঠছে। বাজার ছেয়ে যাচ্ছে নানাবিধ হাল ফ্যাশনের উপহারে। পার্কগুলোতে চলছে ধোয়ামোছা। রেস্তরাঁগুলো সাজছে নতুন সাজে। পৃথিবীর প্রায় সব বড় শহরেই 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'-কে ঘিরে সাজ সাজ রব। পশ্চিমা দেশগুলোর পাশাপাশি প্রাচ্যের দেশগুলোতেও এখন ঐ সংস্কৃতির মাতাল ঢেউ লেগেছে। হৈ চৈ, উন্মাদনা, রাঙায় মোড়া ঝলমলে উপহার সামগ্রী, নামি রেস্তরাঁয় 'ক্যান্ডেল লাইট ডিনার'কে ঘিরে প্রেমিক যুগলের চোখেমুখে এখন বিরাট উত্তেজনা। হিংসা-হানাহানির যুগে ভালবাসার জন্য ধার্য মাত্র এই একটি দিন! প্রেমিক যুগল তাই উপেক্ষা করে সব চোখ রাঙানি। বছরের এ দিনটিকে তারা বেছে নিয়েছে হৃদয়ের কথকতার কলি ফোটাতে।

ভালবাসা দিবস কী?

বছরে মাত্র একটি দিন ও রাত প্রেম সরোবরে ডুব দেয়া, সাঁতার কাটা, চরিত্রের নৈতিক ভূষণ খুলে প্রেম সরোবরের সলিলে হারিয়ে যাওয়ার দিবস হচ্ছে 'ভ্যালেন্টাইনস ডে' বা 'ভালবাসা দিবস'। সারাবিশ্বে ভ্যালেন্টাইন ডে পালিত হয় প্রতি বছর ১৪ ফেব্রুয়ারী।

ইতিহাসে 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'

'ভ্যালেন্টাইনস ডে'র ইতিহাস প্রাচীন। এর উৎস হচ্ছে ১৭শ' বছর আগের পৌত্তলিক রোমকদের মাঝে প্রচলিত 'আধ্যাত্মিক ভালবাসা'র উৎসব। এ পৌত্তলিক উৎসবের সাথে কিছু কল্পকাহিনী জড়িত ছিল, যা পরবর্তীতে রোমীয় খৃষ্টানদের মাঝেও প্রচলিত হয়। এ সমস্ত কল্প-কাহিনীর অন্যতম হচ্ছে, এ দিনে পৌত্তলিক (অগ্নি উপাসক) রোমের পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত রোমিউলাস নামক জনৈক ব্যক্তি একদা নেকড়ের দুধ পান করায় অসীম শক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী হয়ে প্রাচীন রোমের প্রতিষ্ঠা করেন। রোমানরা এ পৌরাণিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে ১৫ ফেব্রুয়ারী উৎসব পালন করত। এ দিনে পালিত বিচিত্র অনুষ্ঠানাদির মধ্যে একটি হচ্ছে, দু'জন শক্তিশালী পেশীবহুল যুবক গায়ে কুকুর ও ভেড়ার রক্ত মাখত। অতঃপর দুধ দিয়ে তা ধুয়ে ফেলার পর এ দু'জনকে সামনে নিয়ে বের করা হ'ত দীর্ঘ পদযাত্রা। এ দু'যুবকের হাতে চাবুক থাকত, যা দিয়ে তারা পদযাত্রার সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে আঘাত করত। রোমক রমণীদের মাঝে কুসংস্কার ছিল যে, তারা যদি এ চাবুকের আঘাত গ্রহণ করে, তবে তারা বন্ধ্যাত্ব থেকে মুক্তি পাবে। এ উদ্দেশ্যে তারা এ মিছিলের সামনে দিয়ে যাতায়াত করত।

রোমকরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পরও এ উৎসব উদ্‌যাপনকে অব্যাহত রাখে। কিন্তু এর পৌত্তলিক খোলস পাল্টে ফেলে খৃষ্টীয় খোলস পরানোর জন্য তারা এ উৎসবকে ভিন্ন এক ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট করে। সেটা হচ্ছে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন নামক জনৈক খৃষ্টান সন্ন্যাসীর জীবনোৎসর্গ করার ঘটনা। ইতিহাসে এরূপ দু'জন সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের কাহিনী পাওয়া যায়। এদের একজন সম্পর্কে দাবী করা হয় যে, তিনি শান্তি ও প্রেমের বাণী প্রচারের ব্রত নিয়ে জীবন দিয়েছিলেন। তার স্মরণেই রোমক খৃষ্টানরা এ উৎসব পালন অব্যাহত রাখে। কালক্রমে 'আধ্যাত্মিক ভালবাসা'র উৎসব রূপান্তরিত হয় জৈবিক কামনা ও যৌনতার উৎসবে। পরবর্তীতে রোমানরা খৃষ্টানদের অধীনে আসলে তাদের অনেকেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। খৃষ্টান ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ধর্মবিরোধী, সমাজ বিধ্বংসী ও ব্যভিচার বিস্তারকারী এ প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন। এমনকি খৃষ্টধর্মের প্রাণকেন্দ্র ইতালীতে এ প্রথা অবশেষে বিলুপ্ত করা হয়। কিন্তু আঠারো ও উনিশ শতকে তা পুনরায় চালু হয়।

ক্যাথলিক বিশ্বকোষে ভ্যালেনটাইন ডে সম্পর্কে তিনটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন বইয়ে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা উদ্ধৃত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি ঘটনা নিম্নরূপ :

১ম বর্ণনা : রোমের সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াস-এর আমলের ধর্মযাজক সেন্ট ভ্যালেনটাইন ছিলেন শিশুপ্রেমিক, সামাজিক ও সদালাপী এবং খৃষ্টধর্ম প্রচারক। আর রোম সম্রাট ছিলেন দেব-দেবীর পূজায় বিশ্বাসী। সম্রাটের তরফ থেকে তাকে দেব-দেবীর পূজা করতে বলা হ'লে ভ্যালেন্টাইন তা অস্বীকার করেন। ফলে তাকে কারারুদ্ধ করা হয়। রোম সম্রাটের বারবার খৃষ্টধর্ম ত্যাগের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে ২৭০ খৃস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রীয় আদেশ লঙ্ঘনের অভিযোগে সম্রাট ভ্যালেন্টাইনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

২য় বর্ণনা : খৃষ্টীয় ইতিহাস অনুযায়ী এ দিবসের সূত্রপাত হয় ২৬৯ খৃষ্টাব্দে। সাম্রাজ্যবাদী, রক্তলোলুপ রোমান সম্রাট

---

* *গোবিন্দা, পাবনা।*

১২৭. *চারটি অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত 'ভালবাসা' শব্দের আরবী প্রতিশব্দ 'মুহাব্বাত' ও ইংরেজি Love। এর অর্থ- অনুভূতি, আকর্ষণ, হৃদয়ের টান; যা আল্লাহ তা'আলা মানবহৃদয়ে সৃষ্টিগতভাবে দিয়েছেন। ভালবাসা দু'ধরনের (১) বৈধ ও পবিত্র, (২) অবৈধ ও অপবিত্র। যুবক-যবতীর বিবাহপূর্ব সম্পর্ক হচ্ছে অবৈধ ও অপবিত্র ভালবাসা। আর আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল (ছাঃ), সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও স্বামী-স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা হচ্ছে পবিত্র ভালবাসা।*
(http://www.islamhouse.com/bn_al_hubbul_masmuhu)

ক্লডিয়াসের দরকার ছিল এক বিশাল সৈন্যবাহিনীর। এক সময় তার সেনাবাহিনীতে সেনা সংকট দেখা দেয়। কিন্তু কেউ তার সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে রাযী নয়। সম্রাট লক্ষ্য করলেন যে, অবিবাহিত যুবকরা যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে অত্যধিক ধৈর্যশীল। ফলে তিনি যুবকদের বিবাহ কিংবা যুগলবন্দী হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। যাতে তারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে অনীহা প্রকাশ না করে। তার এ ঘোষণায় দেশের তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীরা ক্ষেপে যায়। সেন্ট ভ্যালেন্টাইন নামের এক ধর্মযাজকও সম্রাটের এ নিষেধাজ্ঞা মেনে নিতে পারেননি। প্রথমে তিনি ভালবেসে সেন্ট মারিয়াসকে বিয়ের মাধ্যমে রাজার আদেশকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার গীর্জায় গোপনে বিয়ে পড়ানোর কাজ চালাতে থাকেন। একটি রুমে বর-বধূ বসিয়ে মোমবাতির স্বল্প আলোয় ভ্যালেন্টাইন ফিস ফিস করে বিয়ের মন্ত্র পড়াতেন। কিন্তু এ বিষয়টি এক সময়ে সম্রাট ক্লডিয়াস জেনে যান। তিনি সেন্ট ভ্যালেন্টাইনকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। ২৭০ খৃষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারী সৈন্যরা ভ্যালেন্টাইনকে হাত-পা বেঁধে টেনে-হিঁচড়ে সম্রাটের সামনে হাযির করলে তিনি তাকে হত্যার আদেশ দেন। ঐ দিনের শোক গাঁথায় আজকের 'ভ্যালেন্টাইন ডে'।

অন্য বর্ণনা মতে, সেন্ট ভ্যালেন্টাইন কারারুদ্ধ হওয়ার পর প্রেমাসক্ত যুবক-যুবতীদের অনেকেই প্রতিদিন তাকে কারাগারে দেখতে আসত এবং ফুল উপহার দিত। তারা বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক কথা বলে সেন্ট ভ্যালেন্টাইনকে উদ্দীপ্ত রাখত। জনৈক কারারক্ষীর এক অন্ধ মেয়েও ভ্যালেন্টাইনকে দেখতে যেত। অনেকক্ষণ ধরে তারা দু'জন প্রাণ খুলে কথা বলত। এক সময় ভ্যালেন্টাইন তার প্রেমে পড়ে যায়। সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের আধ্যাত্মিক চিকিৎসায় অন্ধ মেয়েটি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। ভ্যালেন্টাইনের ভালবাসা ও তার প্রতি দেশের যুবক-যুবতীদের ভালবাসার কথা সম্রাটের কানে যায়। এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে মৃত্যুদণ্ড দেন। তাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল ২৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারী।

৩য় বর্ণনা : গোটা ইউরোপে যখন খৃষ্টান ধর্মের জয়জয়কার, তখনও ঘটা করে পালিত হ'ত রোমীয় একটি রীতি। মধ্য ফেব্রুয়ারীতে গ্রামের সকল যুবকরা সমস্ত মেয়েদের নাম চিরকুটে লিখে একটি জারে বা বাক্সে জমা করত। অতঃপর ঐ বাক্স হ'তে প্রত্যেক যুবক একটি করে চিরকুট তুলত, যার হাতে যে মেয়ের নাম উঠত, সে পূর্ণবৎসর ঐ মেয়ের প্রেমে মগ্ন থাকত। আর তাকে চিঠি লিখত, এ বলে *'প্রতিমা মাতার নামে তোমার প্রতি এ পত্র প্রেরণ করছি।'* বৎসর শেষে এ সম্পর্ক নবায়ন বা পরিবর্তন করা হ'ত। এ রীতিটি কতক পাদ্রীর গোচরীভূত হ'লে তারা একে সমূলে উৎপাটন করা অসম্ভব ভেবে শুধু নাম পাল্টে দিয়ে একে খৃষ্টান ধর্মায়ন করে দেয় এবং ঘোষণা করে এখন থেকে এ পত্রগুলো 'সেন্ট ভ্যালেনটাইন'-এর নামে প্রেরণ করতে হবে। কারণ এটা খৃষ্টান নিদর্শন, যাতে এটা কালক্রমে খৃষ্টান ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

৪র্থ বর্ণনা : প্রাচীন রোমে দেবতাদের রাণী জুনো (Juno)'র সম্মানে ১৪ ফেব্রুয়ারী ছুটি পালন করা হ'ত। রোমানরা বিশ্বাস করত যে, জুনোর ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কোন বিয়ে সফল হয় না। ছুটির পরদিন ১৫ ফেব্রুয়ারী লুপারকালিয়া ভোজ উৎসবে হাযারো তরুণের মেলায় র‍্যাফেল ড্র'র মাধ্যমে সঙ্গী বাছাই প্রক্রিয়া চলত। এ উৎসবে উপস্থিত তরুণীরা তাদের নামাংকিত কাগজের স্লিপ জনসম্মুখে রাখা একটি বড় পাত্রে (জারে) ফেলত। সেখান থেকে যুবকের তোলা স্লিপের তরুণীকে কাছে ডেকে নিত। কখনও এ জুটি সারা বছরের জন্য স্থায়ী হ'ত এবং ভালবাসার সিঁড়ি বেয়ে বিয়েতে পরিণতি ঘটত।

৫ম বর্ণনা : রোমানদের বিশ্বাসে ব্যবসা, সাহিত্য, পরিকল্পনা ও দস্যুদের প্রভু 'আতারিত' এবং রোমানদের সবচেয়ে বড় প্রভু 'জুয়াইবেতার' সম্পর্কে ভ্যালেনটাইনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। সে উত্তরে বলে, এগুলো সব মানব রচিত প্রভু, প্রকৃত প্রভু হচ্ছে, 'ঈসা মসীহ'। এ কারণে তাকে ১৪ ফেব্রুয়ারীতে হত্যা করা হয়।

৬ষ্ঠ বর্ণনা : কথিত আছে যে, খৃষ্টধর্মের প্রথম দিকে রোমের কোন এক গীর্জার ভ্যালেন্টাইন নামক দু'জন সেন্ট (পাদ্রী)-এর মস্তক কর্তন করা হয় নৈতিক চরিত্র বিনষ্টের অপরাধে। তাদের মস্তক কর্তনের তারিখ ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারী। ভক্তেরা তাদের 'শহীদ' (!) আখ্যা দেয়। রোমান ইতিহাসে শহীদের তালিকায় এ দু'জন সেন্টের নাম রয়েছে। একজনকে রোমে এবং অন্যজনকে রোম থেকে ৬০ মাইল (প্রায় ৯৭ কি.মি.) দূরবর্তী ইন্টারামনায় (বর্তমান নাম Terni) 'শহীদ' করা হয়। ইতিহাসবিদ কর্তৃক এ ঘটনা স্বীকৃত না হ'লেও দাবী করা হয় যে, ২৬৯ খৃষ্টাব্দে 'ক্লাউডিয়াস দ্যা গথ'-এর আমলে নির্যাতনে তাদের মৃত্যু ঘটে। ৩৫০ খৃষ্টাব্দে রোমে তাদের সম্মানে এক রাজপ্রাসাদ (Basilica) নির্মাণ করা হয়। ভূগর্ভস্থ সমাধিতে একজনের মৃতদেহ আছে বলে অনেকের ধারণা।

অন্য এক তথ্যে জানা যায়, রোমে শহীদ ইন্টারামনা গীর্জার বিশপকে ইন্টারামনা ও রোমে একই দিনে স্মরণ করা হয়ে থাকে। রোমান সম্রাট ২য় ক্লাউডিয়াস ২০০ খৃষ্টাব্দে ফরমান জারী করেন যে, তরুণরা বিয়ে করতে পারবে না। কারণ অবিবাহিত তরুণরাই দক্ষ সৈনিক হ'তে পারে এবং দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। ভ্যালেন্টাইন নামের এক তরুণ সম্রাটের আইন অমান্য করে গোপনে বিয়ে করে। কেউ কেউ বলেন, রাজকুমার এ আইন লংঘন করেন।

৭ম বর্ণনা : ৮২৭ খৃষ্টাব্দে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন নামের এক ব্যক্তি রোমের পোপ নির্বাচিত হয়েছিল। তিনি তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য এবং সুন্দর ব্যবহার দিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই রোমবাসীর মন জয় করে নিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র ৪০ দিন দায়িত্ব পালনের পরই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। প্রিয় পোপের মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে ১৪ ফেব্রুয়ারী রোমবাসী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অনেকের মতে এভাবেই 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র সূচনা হয়।[১২৮]

প্রাচীনকালে রোমানরা নেকড়ে বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে লুপারকালিয়া নামে ভোজানুষ্ঠান করত প্রতি বছর ১৫ ফেব্রুয়ারী। এ ভোজানুষ্ঠানের দিন তরুণরা গরুর চামড়া দিয়ে একে অন্যকে আঘাত করত। মেয়েরাও উৎসবে মেতে উঠত। ভ্যালেন্টাইন নামের কোন বিশিষ্ট বিশপ প্রথমে এর উদ্বোধন করেন। সেই থেকে এর নাম হয়েছে ভ্যালেন্টাইন, তা থেকে দিবস। রোমানরা ৪৩ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেন জয় করে। এ কারণে ব্রিটিশরা অনেক রোমান অনুষ্ঠান গ্রহণ করে নেয়। অনেক গবেষক এবং ঐতিহাসিক Lupercalia অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভ্যালেন্টাইন অনুষ্ঠানের একটা যোগসূত্র আছে বলে মনে করেন। কেননা এতে তারিখের অভিন্নতা ও দু'টি অনুষ্ঠানের মধ্যে চরিত্রগত সাযুজ্য রয়েছে।

ভালবাসা দিবস উদ্‌যাপনের সূচনা

'ভ্যালেন্টাইনস ডে'র ইতিহাস থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, ১৪ ফেব্রুয়ারীতে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন প্রেমের পূজারী সিদ্ধপুরুষরূপে ভালবাসার বাণী বিনিময়ের মূর্তপ্রতীক হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। ভ্যালেন্টাইন ডে'র প্রচলনের এটাই হ'ল আদি ইতিহাস। এ দিবসের ইতিহাসে বর্ণিতে লটারীর বিষয়টি পরবর্তীতে পোপ গেলাসিয়াস কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং এ দিবসকে খৃষ্টীয় ফ্লেভার দিতে 'ভ্যালেন্টাইনস ডে' নামের মোড়ক দিয়ে আবৃত করেন। মজার কথা হ'ল ১৪ শতকের আগেও ভ্যালেন্টাইন দিবসের সাথে ভালবাসার কোন সম্পর্ক ছিল না। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক জেওফ্রে চসার (Geoffery Chaucer) তার 'The Parliament of Fowls' কবিতায় পাখিকে প্রেমিক-প্রেমিকা হিসাবে কল্পনা করেছেন। মধ্যযুগে ফ্রান্সে এবং ইংল্যান্ডে বিশ্বাস করা হ'ত যে, ফেব্রুয়ারী মাস হ'ল পাখির প্রজনন কাল। চসার তার কবিতায় লিখেছেন, 'For this was on St. valentine's day, when every fowl cometh there to choose his mate.' বস্তুতঃ চসারের এ কবিতার মাধ্যমেই 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'র মধ্যে ভালবাসা জিনিসটি ঢুকে যায় এবং আস্তে আস্তে ব্যাপকতা লাভ করে। লেখক Henry Ansgar Kelly তার 'Chaucer and cult of Saint Valentine' বইতে এ ব্যাপারটি ভালভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মূলতঃ আজকের ভালবাসা দিবসের উৎপত্তি ভালবাসা দিবস হিসাবে হয়নি।

৫ম শতাব্দী (৪৯৬ খৃ.) থেকেই দিনটিতে কবিতা, ফুল, উপহার সামগ্রী পাঠিয়ে প্রিয়জনকে বিশেষ স্মরণের রেওয়াজ শুরু হয়। ইংল্যান্ডের মানুষ ১৪শ' শতাব্দীর শুরু থেকে ভ্যালেন্টাইন দিবস উদ্‌যাপন শুরু করেছে। ঐতিহাসিকদের অভিমত, ভ্যালেন্টাইন দিবসে ইংল্যান্ডে প্রিয়জনের কাছে কবিতার চরণ প্রেরণের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালনের রেওয়াজ শুরু হয়। ফরাসি বংশোদ্ভূত অর্লিন্স (Orleans)-এর ডিউক চার্লসকে ১৪১৫ সালে অজিনকোর্টের যুদ্ধে ইংরেজরা গ্রেফতার করে এবং ইংল্যান্ডে এনে কারাবন্দি করে। ১৪ ফেব্রুয়ারী ভ্যালেন্টাইন দিবসে এ ডিউক তার স্ত্রীর কাছে ছন্দময় ভাষায় লন্ডন টাওয়ারের কারাগার থেকে পত্র লেখেন। ইংল্যান্ডে সেই থেকে ভ্যালেন্টাইনস দিবস উদ্‌যাপন শুরু।

মধ্য ইংল্যান্ডের ডারবিশায়ার কাউন্টির তরুণীরা 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'র মধ্য রাতে দল বেধে ৩ থেকে ১২ বার চার্চ প্রদক্ষিণ করত এবং এ চরণগুলো সুর দিয়ে আবৃত্তি করত প্রদক্ষিণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত :

I sow hempseed
Hempseed I sow,
He that love me best,
Come after me now.

তারা মনে করত এ কথাগুলো বারবার আবৃত্তি করলে রাত্রিতে প্রেমিকজন অবশ্যই ধরা দেবে।

এ দিবসে যা যা করা হয়

পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে এ দিনে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, এমনকি পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও উপহার বিনিময় হয়। উপহার সামগ্রীর মধ্যে আছে পত্র বিনিময়, খাদ্যদ্রব্য, ফুল, বই, ছবি, 'Be my valentine' (আমার ভ্যালেন্টাইন হও), প্রেমের কবিতা, গান, শোক লেখা কার্ড প্রভৃতি। গ্রীটিং কার্ডে, উৎসব স্থলে অথবা অন্য স্থানে প্রেমদেব (Cupid)-এর ছবি বা মূর্তি স্থাপিত হয়। সেটা হ'ল একটি ডানাওয়ালা শিশু, তার হাতে ধনুক এবং সে প্রেমিকার হৃদয়ের প্রতি তীর নিশান লাগিয়ে আছে। এ দিন স্কুলের ছাত্ররা তাদের ক্লাসরুম সাজায় অনুষ্ঠান করে।

১৮শ' শতাব্দী থেকেই শুরু হয়েছে ছাপানো কার্ড প্রেরণ। এ সব কার্ডে ভাল-মন্দ কথা, ভয়-ভীতি আর হতাশার কথাও থাকত। ১৮শ' শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে উনবিংশ

১২৮. *http://wiki/valentine's day, www.islamqa.com*

শতাব্দীর প্রথম দিকে যে সব কার্ড ভ্যালেন্টাইন ডে'তে বিনিময় হ'ত তাতে অপমানজনক কবিতাও থাকত।

সবচেয়ে যে জঘন্য কাজ এ দিনে করা হয়, তা হ'ল ১৪ ফেব্রুয়ারী মিলনাকাঙ্ক্ষী অসংখ্য যুগল সবচেয়ে বেশী সময় চুম্বনাবদ্ধ হয়ে থাকার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া। আবার কোথাও কোথাও চুম্বনাবদ্ধ হয়ে ৫ মিনিট অতিবাহিত করে ঐ দিনের অন্যান্য প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশে ভ্যালেন্টাইন ডে :

ভালবাসায় মাতোয়ারা থাকে ভালবাসা দিবসে রাজধানীসহ দেশের বড় বড় শহরগুলো। পার্ক, রেস্তোরাঁ, ভার্সিটির করিডোর, টিএসসি, ওয়াটার ফ্রন্ট, ঢাবির চারুকলার বকুলতলা, আশুলিয়া- সর্বত্র থাকে প্রেমিক-প্রেমিকাদের তুমুল ভিড়। 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে' উপলক্ষে অনেক তরুণ দম্পতিও হাযির হয় প্রেমকুঞ্জগুলোতে।

ঢাকার প্যান প্যাসেফিক সোনারগাঁও হোটেলের আয়োজনে 'ভ্যালেন্টাইনস ডে' উদ্‌যাপন উপলক্ষে হোটেলের বলরুমে বসে তারুণ্যের মিলন মেলা। 'ভালবাসা দিবস'-কে স্বাগত জানাতে হোটেল কর্তৃপক্ষ বলরুমকে সাজান বর্ণাঢ্য সাজে। নানা রঙের বেলুন আর অসংখ্য ফুলে স্বপ্নিল করা হয় বলরুমের অভ্যন্তর। জম্পেশ অনুষ্ঠানের সূচিতে থাকে লাইভ ব্যান্ড কনসার্ট, ডেলিশাস ডিনার এবং উদ্দাম নাচ। আগতদের সিংহভাগই অংশ নেয় সে নাচে। ঘড়ির কাটা যখন গিয়ে ঠেকে রাত দু'টার ঘরে তখন শেষ হয় প্যান প্যাসেফিক সোনারগাঁও হোটেলের 'ভালবাসা দিবস' বরণের অনুষ্ঠান।[১২৯]

রাজধানীর পাঁচতারা হোটেলগুলোতে এ দিবস উদ্‌যাপনের অনুকরণে দেশের মেট্রোপলিটন শহরগুলোর বড় বড় হোটেলগুলোও এ দিবস উদ্‌যাপন শুরু করেছে প্রায় একই ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

ঢাবির টিএসসি এলাকায় প্রতি বছর এ দিবসে বিকেল বেলা অনুষ্ঠিত হয় ভালবাসা র‍্যালি। এতে বেশ কিছু খ্যাতিমান দম্পতির সাথে প্রচুর সংখ্যক তরুণ-তরুণী, প্রেমিক-প্রেমিকা যোগ দেয়। প্রেমের কবিতা আবৃত্তি, প্রথম প্রেম, দাম্পত্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদির স্মৃতি চারণে অংশ নেয় তারা।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী এমনকি বুড়া-বুড়িরা পর্যন্ত নাচতে শুরু করে! তারা পাঁচতারা হোটেলে, পার্কে, উদ্যানে, লেকপাড়ে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আসে ভালবাসা বিলাতে, অথচ তাদের নিজেদের ঘর-সংসারে ভালবাসা নেই! আমাদের বাংলাদেশী ভ্যালেন্টাইনরা যাদের অনুকরণে এ দিবস পালন করে, তাদের ভালবাসা জীবনজ্বালা আর জীবন জটিলতার নাম; মা-বাবা, ভাই-বোন হারাবার নাম; নৈতিকতার বন্ধন মুক্ত হওয়ার নাম। তাদের ভালবাসার পরিণতি 'ধর ছাড়' আর 'ছাড় ধর' নতুন নতুন সঙ্গী। তাদের এ ধরা-ছাড়ার বেলেলাপনা চলতে থাকে জীবনব্যাপী।

ইসলামের দৃষ্টিতে 'ভ্যালেন্টাইনস ডে' উদ্‌যাপন

বর্তমান অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে স্যাটেলাইটের কল্যাণে মুসলিম সমাজ পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণ করছে। নিজেদের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্যকে ভুলে গিয়ে, ধর্মীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে তারা আজকে প্রগতিশীল হওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে তাদের কর্মকাণ্ডে মুসলিম জাতির উঁচু শির নত হচ্ছে। অথচ এটা বহুপূর্বে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করে গেছেন।

ছাহাবী আবু অকেদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) খায়বার যাত্রায় মূর্তিপূজকদের একটি গাছ অতিক্রম করলেন। তাদের নিকট যে গাছটির নাম ছিল 'জাতু আনওয়াত'। এর উপর তীর টানিয়ে রাখা হ'ত। এ দেখে কতক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের জন্যও এমন একটি 'জাতু আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন। রাসূল (ছাঃ) ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, 'সুবহানাল্লাহ, এ তো মূসা (আঃ)-এর জাতির মত কথা। আমাদের জন্য একজন প্রভু তৈরি করে দিন, তাদের প্রভুর ন্যায়। আমি নিশ্চিত, আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, তোমরা পূর্ববর্তীদের আচার-অনুষ্ঠানের অন্ধানুকরণ করবে'।[১৩০] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই একজন বলে গণ্য হবে'।[১৩১]

মানুষের অন্তর যদিও অনুকরণপ্রিয়, তবুও মনে রাখতে হবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ বিচারে এটি গর্হিত, নিন্দিত। বিশেষ করে অনুকরণীয় বিষয় যদি হয় আক্বীদা, ইবাদত, ধর্মীয় আলামত বিরোধী, আর অনুকরণীয় ব্যক্তি যদি হয় বিধর্মী, বিজাতী। দুর্ভাগ্য যে, মুসলমানরা ক্রমশ ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসে দুর্বল হয়ে আসছে এবং বিজাতীদের অনুকরণ ক্রমান্বয়ে বেশি বেশি আরম্ভ করছে। যার অন্যতম ১৪ ফেব্রুয়ারী বা ভালবাসা দিবস। মুসলমানদের জন্য এসব বিদস পালন জঘন্য অপরাধ।

---

১২৯. বিভিন্ন দৈনিকে ১৫ ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত সংবাদ অবলম্বনে।

১৩০. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪০৮, 'কিতাবুল ফিতান', হাদীছ ছহীহ।

১৩১. আহমাদ ২/৫০; আবূ দাঊদ হা/৪০৩১; ছহীহুল জামে' হা/৬০২৫।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'কাফিরদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাদের শুভেচ্ছা জানানো একটি কুফরী কাজ। কারো দ্বিমত নেই এতে। যেমন তাদের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে 'শুভেচ্ছা' বলা, শুভ কামনা জানানো। এগুলো কুফরী বাক্য না হ'লেও ইসলামী দৃষ্টিকোণ হ'তে হারাম। কারণ এর অর্থ হ'ল, একজন লোক ক্রুশ, মূর্তি ইত্যাদিকে সিজদা করছে, আর আপনি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। এটা একজন মদ্যপ ও হত্যাকারীকে শুভেচ্ছা জানানোর চেয়েও জঘন্য।

অনেক লোক অবচেতনভাবেই এ সকল অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে, অথচ তারা জানেও না, কত বড় অপরাধ তারা করে যাচ্ছে। শিরক ও কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, ধন্যবাদ দিচ্ছে। এভাবে আল্লাহ্র শাস্তিতে নিপতিত হচ্ছে।

মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ছেদন হচ্ছে আমাদের পথিকৃৎ ছাহাবা, নেককার পূর্ব পুরুষদের একটি বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যারাই বিশ্বাস করে, 'আল্লাহ এক, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ তাঁর রাসূল।' তাদের উচিত ও কর্তব্য, মুসলমানদের মুহাব্বত করা, কাফিরদের ঘৃণা করা, তাদের সাথে বৈরিভাব পোষণ করা, তাদের আচার-অনুষ্ঠান প্রত্যাখ্যান করা। এতেই আমরা নিরাপদ, এখানেই আমাদের কল্যাণ, অন্যথা সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

কেউ কেউ হয়তো বলবে, আমরা তাদের আক্বীদা বিশ্বাস গ্রহণ করি না, শুধু আপোষে মুহাব্বত, ভালবাসা তৈরি করার নিমিত্তে এ দিনটি পালন করি। অথচ এর মাধ্যমে সমাজে অশীলতা ছড়ায়, ব্যভিচার প্রসার লাভ করে। একজন সতী-সাধ্বী পবিত্র মুসলিম নারী বা পুরুষ এ ধরনের নোংরামির সাথে কখনো জড়িত হ'তে পারে না।

এ দিনটি উদ্‌যাপন কোন স্বভাব সিদ্ধ ও স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বরং একজন ছেলেকে একজন মেয়ের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেয়ার পাশ্চাত্য কালচার আমদানিকরণ। আমরা জানি, তারা সমাজকে চারিত্রিক পদস্খলন ও বিপর্যয় হ'তে রক্ষা করার জন্য কোন নিয়ম-নীতির ধার ধারে না। যার কুৎসিত চেহারা আজ আমাদের সামনে স্পষ্ট। তাদের অশালীন কালচারের বিপরীতে আমাদের অনেক সুষ্ঠু-শালীন আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে।

মুসলিম সমাজে এক সময় নীতি-নৈতিকতার মূল্য ছিল সীমাহীন। লজ্জাশীলতা ও শুদ্ধতা ছিল এ সমাজের অলংকার। কোন অপরিচিত মেয়ের সাথে রাস্তায় বের হবার চেয়ে পিঠে বিশাল ভার বহন করা একটা ছেলের জন্য ছিল অধিকতর সহজ। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে তা চিন্তা করারও অবকাশ ছিল না। অথচ সেই অবস্থা থেকে আজ আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি! এটা হচ্ছে 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'-র মত বেলেল্লাপনার কুফল। এসবের দ্বারা সরল, পুণ্যবান, নিষ্কলঙ্ক মানুষ বিপথগামী হচ্ছে।

এ কী করছি আমরা?

আমেরিকা ও ইউরোপ এর লোকজন একই উৎসবে মেতে উঠতে পারে। কারণ তারা এক জাত, এক সভ্যতা, এক সংস্কৃতি, এক ধর্ম এবং একই ধারার লোক। এক দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাই আনন্দ-বেদনার অনুভূতি সর্বত্র অভিন্ন। কিন্তু আমাদের দেহ পৃথক, ওদের চেয়ে আমরা পৃথক প্রায় সব ক্ষেত্রে। তথাপি কেন আমরা নাচি যখন তারা ডুগডুগি বাজায় নিজেদের জন্য। বিলাতের ভ্যালেন্টাইন ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে মুসলিমরাও যদি একইভাবে এ দিবসটি পালন করে, তাহ'লে তাদের ও আমাদের মধ্যে ফারাক থাকল কোথায়? আমরা মুসলিম। ভ্যালেন্টাইন আমাদের নয়, ওদের- এ জ্ঞানটুকুও নেই, এটাই আজ আমাদের জন্য বড় ট্রাজেডি।

পরিশেষে বলব, যখন এ পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক মানুষ না খেয়ে থাকে, যখন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাণ্ডারী শিশুরা ক্ষুধায়, অপুষ্টিতে ভুগে মারা যায়? তখন আমরা অবৈধ বিনোদনের নামে নোংরামী করে অযস্র অর্থ নষ্ট করি কোন মানবিকতায়? অতএব যেকোন মূল্যে এসমস্ত অপসংস্কৃতি থেকে বেঁচে থাকা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ আমাদের সুমতি দান করুন।-আমীন!

ক্ষেত-খামার

ডাল পুঁতে পোকা নিধন

পিরোজপুরের মঠকড়িয়া উপযেলার কৃষকরা ধানক্ষেতের পোকা-মাকড় নিধনে কীটনাশকের পরিবর্তে প্রাকৃতিক পদ্ধতির প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে। চলতি আমন মৌসুমে পোকা-মাকড় নিধনে পাখি বসার জন্য ধানক্ষেতে ছোট ছোট ডাল পুঁতে রাখা বা পার্সিং পদ্ধতির প্রতি কৃষকদের ব্যাপক আগ্রহ দেখা গেছে। মাজরা, পামরি ও লেদাসহ কয়েকটি পোকা ধানের রোয়ার ক্ষতি করে থাকে। এ সকল পোকার অবাধ প্রজনন ক্ষেত্র হলো ধানের রোয়া। প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী দৈহিক আকারে ছোট পাখিরা পোকা-মাকড় ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করে থাকে। ধানক্ষেতে ছোট পাখিরা বসার স্থান পেলে রোয়ার পোকা-মাকড় ভক্ষণ করে পোকার বংশ ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে ধানের ফলন ভাল হয়, কৃষকের কীটনাশকের অর্থ সাশ্রয় হয় এবং পরিবেশও দূষণমুক্ত থাকে। গত ৭/৮ বছর থেকে ধান ক্ষেতে পাখি বসার ডাল পুঁতে রেখে কৃষকরা ভাল ফল পাচ্ছে। পার্সিং পদ্ধতিতে কৃষকের শতকরা ৭০ ভাগ কীটনাশকের অর্থ সাশ্রয় হয়। কৃষকরা এ পার্সিং পদ্ধতি ব্যবহার করায় চলতি আমন মৌসুমে উপযেলায় ব্যাপক পোকার আক্রমণ প্রবণ প্রায় ১ হাযার হেক্টর জমির ফসল রক্ষা পাবে বলে জানা যায়। পার্সিং পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কীটনাশকের ব্যবহার অনেক কমে গেছে। ফলে কীটনাশকের বিক্রি কমে যাওয়ায় উপযেলার প্রায় ২শ' কীটনাশকের দোকানের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী দোকান ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে।

সফল চাষী

১. পান চাষ করে স্বাবলম্বী : (ক) চাঁদপুর যেলার মতলব উত্তর উপযেলার গজরা ইউনিয়নের গজরা টরকী এ্যায়াজকান্দি গ্রামের অমৃতলাল বর্মন ও গনেশ চন্দ্র সরকার পান চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। তারা শ্যালক দুলাভাই মিলে বাড়ির পাশে ৬০ শতক জমিতে পানের চারা রোপণ করেন। কিছুদিন পর চারা গজালে বাঁশ ও হুগলি দিয়ে পাশের গাছের মগডাল পর্যন্ত চারাকে লতিয়ে উঠার ব্যবস্থা করে দেন। এভাবে পানের লতাটি ছড়িয়ে পড়ে গাছের ডালে ডালে। পান গাছের পরিচর্যায় ব্যবহৃত হয় খৈল ও প্রাকৃতিক জৈব সার। পান পাতা সহজে পচে না। ফলে অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায়। ২০টি পানে ১ ছলি, ০৪ ছলিতে এক কান্তা এবং ২০ কান্তায় ১ কুড়ি। ১ কুড়িতে ১৬শ'টি পান। ভরা মৌসুমে ১ কুড়ি পান ৯শ' থেকে হাযার টাকা এবং শীতকালে ১৫শ' থেকে ১৬শ' টাকায় বিক্রি হয়।

অমৃতলাল ৩০ শতক জমিতে পান চাষ করে মাসে ১২ থেকে ১৫ হাযার টাকা আয় করেন। আর গনেশ পান চাষের আয় দিয়ে ৫ সদস্যের সংসার পরিচালনা করে বাড়ীতে একতলা বিল্ডিং ও একটি দু'চালা ঘর সহ উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন।

(খ) লক্ষ্মীপুর যেলার রায়পুর উপযেলার পানচাষীদের মুখে হাসি ফুটেছে। এ উপযেলার বাজারে বছরে প্রায় ৫০ কোটি টাকার পান ক্রয়-বিক্রয় হয়। এলাকার চাহিদা মিটিয়ে পান চলে যায় দেশের বিভিন্ন শহরে। রায়পুর কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, উপযেলায় ৩০৫ হেক্টর জমিতে ১৬২০ বরজে পান চাষ হয়। প্রতি হেক্টর জমিতে পান উৎপাদন হয় প্রায় ৮ হাযার পোন (৮০ পিস)। উৎপাদন খরচ হয় প্রায় আড়াই লাখ টাকা। বর্তমান বাজারে ভাল মানের প্রতি বিড়া (৭২ পিস) পান বিক্রি হয় ১৫০ টাকায়। এ হিসাবে রায়পুরে ৩৬ কোটি ৬০ লাখ টাকার পান উৎপাদন হয়। তবে বেসরকারী হিসাবে পানের উৎপাদন হয় প্রায় ৫০ কোটি টাকার। উপযেলার উত্তর চর আবাবিল, দক্ষিণ চর আবাবিল, উত্তর চরবংশী ও দক্ষিণ চরবংশী ইউনিয়নে পানের আবাদ বেশী হয়। 'পানপল্লী' খ্যাত ক্যাম্পের হাট এলাকার চাষীদের সূত্রে জানা যায়, বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত পানের উৎপাদন ভাল হয় এবং সাইজও বড় হয়। অতি শীত, ঘন কুয়াশা ও ক্ষেতে পানি জমে থাকলে পানের বরজ নষ্ট হয়। একটি বরজ ১০ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তবে মাঝে মাঝে সংস্কার করতে হয়।

২. শশা চাষ করে সফলতা : গোপালগঞ্জ যেলাধীন মুকসুদপুর উপযেলার বামনডাঙ্গা গ্রামের দরিদ্র কৃষক ইলিয়াস শেখ প্রায় সাড়ে চার বিঘা জমিতে শশার চাষ করে সচ্ছলতার মুখ দেখেছেন। ১৯৮৭ সালে সে নিজ গ্রাম বামনডাঙ্গায় গ্রামবাসীর নিকট থেকে কিছু জমি লীজ নিয়ে হাইব্রীড শশা, বেগুন, সীম ইত্যাদির চাষ করে। যাবতীয় খরচ বাদ দিয়ে কিছু কিছু সঞ্চয় করে। মা, স্ত্রী ও তিন পুত্রকে নিয়ে সুখেই কাটছে তার সংসার।

গত বছর সে পার্শ্ববর্তী মহারাজপুর গ্রামে সাড়ে চার বিঘা জমি লীজ নিয়ে শীম, শশা ও বেগুন চাষ করে। স্থানীয় শুভাকাংখীদের নিকট থেকে ১ লাখ টাকা ধার নিয়ে চাষ শুরু করে। প্রথম বছর সে আশানুরূপ ফসল উৎপাদন করতে পারেনি। এ বছর সে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে বলে জানায়। শশার উৎপাদন সাধারণত ৮০ দিন হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত ৬০ দিনে সে প্রায় ১ লাখ ৬৫ হাযার টাকার ফসল বিক্রি করেছে। আগামী ২০ দিনে আরো প্রায় ১ লাখ টাকার ফসল তুলতে পারবে বলে সে জানায়।

৩. পেঁপে চাষে সাফল্য : পেঁপে একটি উৎকৃষ্ট মানের প্রোটিন ও ভিটামিন সমৃদ্ধ খাদ্য। পেঁপে যকৃৎ ও পরিপাক তন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। পেঁপে চাষ করে চট্টগ্রামের পটিয়ার অনেক লোক সাফল্য অর্জন করেছে। পটিয়া কৃষি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র সূত্রে জানা যায়, চলতি বছর এ উপযেলার ১৪-১৫ জন ব্যক্তি শৌখিন চাষ হিসাবে এ পেঁপে চাষ করেছে। প্রত্যেকে ২০০ থেকে ৪০০ চারা রোপণের মাধ্যমে এক একটি বাগান সৃষ্টি করেছে। পেঁপে চাষে তেমন পরিশ্রম নেই। গাছ বড় হওয়া পর্যন্ত মাঝে মাঝে একটু আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। পটিয়া কৃষি উদ্যান কেন্দ্র সূত্রে জানা যায়, ২০ শতক জমিতে পেঁপে চাষ করে ১ লাখ টাকা আয় করা যায়।

১৫ লাখ হেক্টর জমির ধানে আর্সেনিক

দেশের প্রায় ১৫ লাখ হেক্টর জমির ধানে ক্ষতিকারক মাত্রার আর্সেনিকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ইরি) এক গবেষণার ফলাফলে এ তথ্য পাওয়া গেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদহ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, কুষ্টিয়া, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেলার মাটি ও পানি থেকে ক্ষতিকর মাত্রায় আর্সেনিক ধানে প্রবেশ করছে। প্রতি কেজি চালে দশমিক ১ পিপিএম মাত্রার আর্সেনিক থাকলে তা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক না উল্লেখ করে ইরির গবেষকেরা জানিয়েছেন, ওই ১৫ লাখ হেক্টর জমিতে উৎপাদিত ধানে দশমিক ২ থেকে দশমিক ৪ পিপিএম মাত্রার আর্সেনিক পাওয়া গেছে।

'দরিদ্র মানুষকে আর্সেনিকের ঝুঁকিমুক্ত করা' শীর্ষক ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, কলে ধান ভাঙ্গানো ও সিদ্ধ করে রান্নার ফলে চাল থেকে আর্সেনিকের পরিমাণ ৪০ শতাংশ কমে যায়। তবে সে ক্ষেত্রে রান্না করার পর ভাতের মাড় না খেয়ে ফেলে দিতে হবে। বসা ভাত (মাড় না ফেলে শুকিয়ে ফেলা ভাত) রান্না করলে তাতে আর্সেনিক রয়ে যায়।

কবিতা

২১শে ফেব্রুয়ারী না ৮ই ফাল্গুন?

-মাক্বছূদ আলী মুহাম্মাদী
ইটাগাছা (পশ্চিম), সাতক্ষীরা।

জীবনে একটি আশা মা ও মাতৃভাষা
সর্বোপরি করিব সম্মান,
যত বাঁধা আসে দলিব নিমিষে
দিতে হ'লে দিব জান কুরবান।
মায়ের মুখের কথা মোর হৃদয়ে গাঁথা
শৈশবে শিখেছি আঁধো আঁধো বোল,
তাই জন্ম থেকে মৃত্যু মায়ের ভাষাই সত্য
মনের ভাব প্রকাশে ইহাই সম্বল।
আমরা বাঙ্গালী বাংলায় কথা বলি
বাংলাতেই করি মনের ভাব প্রকাশ,
হাটে-মাঠে-ঘাটে বিদ্যালয়ে, আদালত তটে
সর্বত্র করিব বাংলা ভাষাকেই বিকাশ।
সালাম, বরকত, রফীক
মাতৃভাষাকে রাখিতে সঠিক
পীচ ঢালা রাজপথ করিল খুনে রঞ্জিত,
আরো নাম না জানা স্মরণাতীত কত জনা
তাঁদের তাজা রক্তে সারা বাংলা প্রলেপিত।
তাঁদের রক্তকণা বৃথা যেতে দিব না
বাংলার বুকে বাংলাকে রাখিব রাষ্ট্রভাষা,
অলিতে গলিতে সাল গণনাতে
ভিন্ন ভাষা করিব ত্যাগ, ইহাই প্রত্যাশা।
ভাষা আন্দোলন 'বাংলা তারিখে' রাখিব স্মরণ
কেন বলিব একুশে ফেব্রুয়ারী?
বলিতে শরম পায় আজও ভিন্ন ভাষায়
ভাষা আন্দোলন স্মরণ করি।
কেন স্মরিব ভিন্ন ভাষে কেন বলিব '৫২-র একুশে?
বাংলায় কি নাই সন, তারিখ গণনা?
কেন বলি না '৮ই ফাল্গুন' দীপ্ত কণ্ঠে আমরা দ্বিগুণ
১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ভাষা আন্দোলনের সূচনা?
সেই দিন সমুন্নত হবে বাংলা ভাষা বিশ্বের বুকে
স্মরিব যেদিন '৫৯-এর ৮ই ফাল্গুন,
২১শে ফেব্রুয়ারী পরিহার করি
সেদিনই স্বার্থক হবে 'ভাষা আন্দোলন'।

***

ভোর বিহানে

-আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

ভোর বিহানে শয্যা ত্যাগী
আযান শুনি মসজিদে,
কেউ কি পারে থাকতে শুয়ে
সুখ শয্যায় ঘাপটি দে?
মুমিনগণকে ডাক দে বলে
আর নয় ঘুম ওঠরে ওঠ,
অযূ সেরে ত্বরা করে
মসজিদ পানে ছোটরে ছোট।
নয় তো এ ডাক মুয়াযযিনের
পাক এলাহীর আহ্বান,
তাই তো আমি যাই ছুটে যাই
রয় না ঘরে আমার প্রাণ।
আমরা গোলাম বিনয় ভরে
তাঁর ইবাদত করব তাই,
তাঁরই ধ্যানে মনের টানে
শয্যা ত্যাগী সেথায় যাই।
এক কাতারে দাঁড়িয়ে পরে
লুটিয়ে পড়ি সেজদাতে,
মন দুয়ারের কপাট খুলে
যাই যে আল্লাহ্র সাক্ষাতে।
লক্ষ্য মোদের সাক্ষ্য আল্লাহ
ডাকি তোমায় প্রাণ ভরে,
তোমার কাছেই সব কিছু চাই
বক্ষ ভাসাই চোখ নীরে।

***

ঐক্য গড়ার ফরমুলা

-আতাউর রহমান
বাঘেরহাট, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

মুসলিম বিশ্বের একই দাবী
ঐক্য তারা চায়
ঐক্য ছাড়া এই দুনিয়ায়
বাঁচার উপায় নাই।
তাক্বলীদ, বিদ'আত, মাযহাবেরে
করি এবার চুর
কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে নেয়ার
সবাই তুলি সুর।
ইজতিহাদের গাড়িটিকে
হাকিয়ে নিয়ে ভাই
রায় ক্বিয়াসের আবর্জনা
মুছে দিয়ে যাই।
ঐক্য গড়ার ফরমুলা এই
কর না আর হেলা
নইলে মোদের আঁধার কেটে
উঠবে নাকো বেলা।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১। ১২টি, তওবা ৩৬; মুহাররম।
২। ইহুদী।
৩। ফেরাঊন ও তার বাহিনীর কবল থেকে মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমের নাজাত লাভের দিন হিসাবে বিখ্যাত।
৪। আহমাদ বিন বুইয়া দায়ালামী ওরফে মুঈযুদদৌলা। ৩৫২ হিজরীতে। বিদ'আত।
৫। ১০ই মুহাররমের ছিয়াম আমি আশা করি আল্লাহ্র নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফফারা হিসাবে গণ্য হবে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। ৩.৫ মিনিট। ২। ৫ মিনিট। ৩। ২.৬ লিটার।
৪। ভিটামিন-ডি। ৫। দুধে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জাতীয় বৃক্ষ)

১। বাংলাদেশের জাতীয় বৃক্ষের নাম কি?
২। বাংলাদেশের জাতীয় বৃক্ষের উৎপত্তিস্থল কোথায়?
৩। এ বৃক্ষকে কবে জাতীয় বৃক্ষ হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়?
৪। বাংলাদেশে মোট কয়টি যেলায় জাতীয় বৃক্ষ জন্মে?
৫। বাংলাদেশের জাতীয় বৃক্ষের উপকারিতা কি?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ইসলামী)

১। ছহীহ বুখারীতে সংকলিত হাদীছের সংখ্যা কতটি?
২। ছহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীছের সংখ্যা কতটি?
৩। সুনানে আবু দাঊদে সংকলিত হাদীছের সংখ্যা কতটি?
৪। সুনানে তিরমিযীতে সংকলিত হাদীছের সংখ্যা কতটি?
৫। সুনানে নাসাঈ ও ইবনু মাজাহতে সংকলিত হাদীছের সংখ্যা কতটি?

সংগ্রহে : বযলুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ ১১ নভেম্বও বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ ফজর পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অনুষ্ঠানে হাফেয আব্দুল জলীলকে পরিচালক করে পাঁজরভাঙ্গা বালক ও বালিকাদের পৃথক দু'টি শাখা গঠন করা হয়।

তনু মনের কথা

জাদীদা
জাগীর হোসেন একাডেমী, পাবনা।

গগণ কোণে বৃষ্টি এলে
তনুমনে কয়,
সবচেয়ে বড় নীল ছাতাটা
করছে তাকে জয়।
মানুষ মোরা হরেক রঙের
কেউবা সাদা-কালো,
সেইতো কেবল আসল মানুষ
ভিতরটা যার আলো।
ছোট্ট শিশু আমরা সবে
কিন্তু শোন ভাই
হাযার শিশু লুকিয়ে আছে
মোদের ভিতরটায়।
সদ্য ফোটা গোলাপ মোরা
যাতে রেণু রয়
সুরভিত হয়ে মোরা
সুগন্ধ ছড়াতে চাই।

জীবন

মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বগুড়া।

জীবন মানে যুদ্ধ বটে
ত্রাস সৃষ্টি নয়
উগ্রতা আর ধৃষ্টতা
জীবন করে ক্ষয়।
জীবন মানে শান্তি বটে
ফুলসজ্জা নয়
সুখের সময় সারা জীবন
নয়তো মধুময়।
জীবন মানে সংশয় বটে
নিরাশ হওয়া নয়।
সমস্যাহীন জীবন যাপন
নয়তো শান্তিময়।
জীবনের শেষ মৃত্যু বটে
আত্মহত্যা নয়।
অকারণে জীবন দেয়া
নয়তো পুণ্যময়।

খেলা ঘর

আবু রায়হান
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

জীবন হ'ল দু'দিনের
খেলার ঘর,
পরকালে বুঝবে মানুষ
কোথায় ভুল তার।
দু'দিনের খেলা ঘরে
যারা করবে অহংকার
পরকালে প্রভু তাদের
করবেন বিচার।
যে দিন ভেঙ্গে যাবে
জীবনের খেলা ঘর
সে দিন হয়ে যাবে
সব কিছুই পর।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও খাতের মধ্যে পুলিশ বিভাগ সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত। এর পরের অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে সরকারী কর্মকর্তা, রাজনৈতিক দল ও বিচার বিভাগ। একই সঙ্গে প্রতি ১০ জন মানুষের মধ্যে ৬ জনই দুর্নীতির শিকার এবং প্রতি চারজনের মধ্যে একজনকে বিভিন্ন কাজের জন্য ঘুষ দিতে হয়েছে। 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' প্রকাশিত গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার (বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির পরিমাপক) প্রতিবেদন থেকে এতথ্য জানা গেছে।

বিচার বিভাগে সর্বাধিক দুর্নীতি-টিআইবি : সেবাখাতের মধ্যে দেশের বিচার বিভাগ সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত। ৮৮ শতাংশ খানা এ খাতের দুর্নীতির শিকার। শুনানী দ্রুত করানো কিংবা শুনানির তারিখ পেছানো, মামলার রায়কে প্রভাবিত করা, ডকুমেন্ট উত্তোলন বা গায়েব করতে ঘুষ বা বিধিবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে তাদের। গত ২৩ ডিসেম্বর 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' (টিআইবি) পরিচালিত 'সেবাখাতের দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০১০'-এ এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। জরিপ অনুযায়ী দুর্নীতির কারণে বছরে প্রায় ৯,৫৯১.৬ কোটি টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ প্রদান করতে হয়েছে। এদিকে এ রিপোর্ট প্রকাশের পর টিআইবি'র তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গত ২৬ ডিসেম্বর কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আদালত তাদের আদালতে হাযির হ'তে সমন জারি করেন।

ডঃ ইউনুসের বিরুদ্ধে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ৭শ' কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের দেয়া ৭শ' কোটি টাকা (১০ কোটি ডলার) গ্রামীণ ব্যাংক থেকে অন্যত্র সরানোর অভিযোগ উঠেছে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মাদ ইউনুসের বিরুদ্ধে। দারিদ্র্য দূর করার জন্য ভর্তুকি হিসাবে গ্রামীণ ব্যাংককে ১৯৯৬ সালে বিপুল পরিমাণ অর্থ দেয় ইউরোপের কয়েকটি দেশ। নরওয়ে, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস ও জার্মানির দেয়া এই অর্থ থেকে ১০ কোটি ডলার বা ৭শ' কোটি টাকারও বেশী গ্রামীণ ব্যাংকের পরিবর্তে 'গ্রামীণ কল্যাণ' নামে নিজের অন্য এক প্রতিষ্ঠানে সরিয়ে নেন ড. ইউনুস। ঢাকার নরওয়েজিয়ান দূতাবাস, নরওয়ে দাতা সংস্থা 'নোরাড' এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এ অর্থ গ্রামীণ ব্যাংকে ফেরত নিতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছে। ১০ কোটি ডলারের মধ্যে সাত কোটি ডলারেরও বেশী অর্থ ড. ইউনুসের 'গ্রামীণ কল্যাণ' নামের প্রতিষ্ঠানেই সরাসরি থেকে যায়। এরপর 'গ্রামীণ কল্যাণে'র কাছ থেকে এই অর্থ ঋণ হিসাবে নেয় গ্রামীণ ব্যাংক। উল্লেখ্য, কোটি কোটি ডলার সরানোর এ ঘটনা যাতে প্রকাশ না হয়, সেজন্য ড. ইউনুস নোরাডের তখনকার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে ১৯৯৮ সালের ১ এপ্রিলে লিখিত চিঠিতে বলেন, 'আপনার সাহায্য আমার দরকার। সরকার এবং সরকারের বাইরের মানুষ বিষয়টি জানতে পারলে আমাদের সত্যিই সমস্যা হবে'।

ক্ষুদ্রঋণের বলির পাঠা হিলারী পল্লী : ক্ষুদ্রঋণের মডেল বলে কথিত যশোরের ঋষী পল্লী ওরফে হিলারী পল্লীর দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের যে কুহেলিকা ড. ইউনুস দেখিয়েছিলেন, তা এখন হাহাকারের জনপদে পরিণত হয়েছে। যশোর-ঝিনাইদহ সড়কের পাশে বারোবাজারের মশিয়াহাটি ঋষী পল্লীতে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য ১৯৯৫ সালের ৩ এপ্রিল সেখানে আনা হয় আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের স্ত্রী হিলারী ক্লিন্টনকে। সেজন্য রাতারাতি পল্লীটির চেহারার পরিবর্তন ঘটানো হয়। নামকরণ করা হয় হিলারী আদর্শ পল্লী। সেই আদর্শ পল্লীর জনগণ সন্তানাদি নিয়ে খুব কষ্টে দিনাতিপাত করছেন। ঋণের জালে আটকা পড়ে ভিটাবাড়ি বিক্রি করে অভাবের তাড়নায় এলাকা থেকে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ঋণগ্রস্ত অনেকের ঘরের টিন খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অথচ ইতিপূর্বে তারা বুট পালিশ, ঝুড়ি ও কুলা তৈরী এবং কমবেশী আবাদী জমি চাষাবাদ করে সংসার নির্বাহ করতো। হিলারী পল্লীর ভক্ত দাস বলেন, 'হিলারী ম্যাডাম এসেছিলেন, অনেক স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল আমাদের। কিন্তু বাস্তবে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছি। শুধু আমি নই, ঋণ নিয়ে কারোরই ভাগ্য ফেরেনি। ১৯৯১ সাল থেকেই ঋষী পল্লীতে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণদান কার্যক্রম শুরু হয়। দীর্ঘ ২৫ বছরে সেখানকার দরিদ্র মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি; বরং সূদখোর মহাজনের ঋণের বিষাক্ত ছোবল তাদেরকে প্রতিনিয়ত দংশন করছে।

দারিদ্র্যসীমার নিচে ৩ কোটি শিশু

দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৩ কোটি শিশু দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। এর মধ্যে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সংখ্যা ৪০ লাখ। ইউনিসেফের তথ্য মতে এক-চতুর্থাংশ শিশু বাস করছে চরম হতদরিদ্র অবস্থায়। তারা সবাই মৌলিক সামাজিক প্রয়োজন তথা আশ্রয়, খাদ্য, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও তথ্য পাওয়ার ন্যূনতম মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত।

খালাস পেয়েও হযরত আলী একযুগ কারাগারে

খালাস পেয়েও দীর্ঘ এক যুগ কারাগারে আটক আছেন সাভারের ফিরিঙ্গীকান্দা এলাকার হযরত আলী। ১৯৯৮ সালে গ্রেফতার হয়ে এখন পর্যন্ত তিনি কারাগারে আছেন বলে মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার' তাদের নভেম্বর মাসের প্রতিবেদনে জানিয়েছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ঢাকার সাভার থানাধীন ফিরিঙ্গীকান্দার বাহেরচর নিবাসী সুমন আলীর ছেলে হযরত আলীকে কেরানীগঞ্জ থানায় দায়েরকৃত মামলায় পুলিশ ১৯৯৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করে। সেদিন থেকে হযরত আলী আজ পর্যন্ত এ কারাগারে বন্দী আছেন। দীর্ঘ ১২ বছরে কখনোই তাকে আদালতে হাজির করা হয়নি। গত ২৪ আগষ্ট হযরত আলী তার বিষয়টি মীমাংসার জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপারের মাধ্যমে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করেন। হযরত আলীর আবেদনের প্রেক্ষিতে তার মামলাটি কোথায় কি অবস্থায় আছে, তা জানার জন্য তল্লাশি শুরু হয়। বেশ কয়েকটি কোর্টে তল্লাশির পর দেখা যায় ২০০৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী ম্যাজিস্ট্রেট শাহিনের আদালতে মামলাটি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং এতে হযরত আলীকে খালাস দেয়া হয়েছে। এর পরও জেল কর্তৃপক্ষ তাকে জেলে আটক রাখে।

বিদেশ

যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গোপন নথি ফাঁস করেছে উইকিলিক্স

যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গোপন নথি ফাঁস করে দুনিয়াজুড়ে আলোচনার ঝড় তুলেছে ওয়েবসাইট উইকিলিক্স। এতে বিশ্ব রাজনীতি ও কূটনীতির বিভিন্ন স্পর্শকাতর বিষয় ফুটে উঠেছে। শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২ লাখ ৫০ হাযার গোপন নথি রয়েছে উইকিলিক্সের সংগ্রহে। পর্যায়ক্রমে এগুলো প্রকাশিত হচ্ছে। এর ফলে উইকিলিক্সের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে লন্ডন পুলিশ ৭ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৯-টায় গ্রেফতার করেছে। তারা বলছে সুইডেনের একটি গ্রেফতারী পরোয়ানা বলে উইকিলিক্সের প্রতিষ্ঠাতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যৌন নিপীড়নের অভিযোগে অ্যাসাঞ্জের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে সুইডিশ কর্তৃপক্ষ। তবে সে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে অ্যাসাঞ্জ বলে আসছেন, এসব তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। ১৬ ডিসেম্বর শর্ত সাপেক্ষে তাকে যামিন দেয়া হয়েছে।

জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের জীবনকাহিনী : সারা বিশ্বে হৈচৈ ফেলে দেয়া ওয়েবসাইট ইউকিলিক্সের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান পল অ্যাসাঞ্জ অস্ট্রেলিয়ার ছোট্ট দ্বীপ কুইন্সল্যান্ডের টাউন্সভিলে ১৯৭১ সালের ৩রা জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। মা-বাবা থিয়েটারের সাথে জড়িত থাকার কারণে শৈশব থেকেই তার যাযাবর জীবন শুরু। অ্যাসাঞ্জের ৮ বছর বয়সে মা-বাবার ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর মা এক সংগীতশিল্পীকে বিয়ে করেন। কিন্তু সৎ বাবার অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে মা ক্রিস্টিন ক্লেয়ার অ্যাসাঞ্জ ও তার ছোট সৎ ভাইকে নিয়ে পলায়ন করেন। এ সময় পাঁচ বছরে মোট ৩৭ বার তাদের থাকার জায়গা বদলাতে হয়েছে এবং সৎ বাবা কর্তৃক সন্তান অপহরণের আতংকে কাটাতে হয়েছে। তারা যে বাসায় থাকতেন তার পাশে একটি ইলেকট্রনিক্সের দোকানে গিয়ে অ্যাসাঞ্জ কম্পিউটারের বোতাম চাপাচাপি করতেন। তারপর মা তাকে একটা কম্পিউটার কিনে দিলে তিনি দ্রুত এ বিষয়ে দক্ষ হয়ে ওঠেন। তখন তিনি বিভিন্ন কম্পিউটার প্রোগ্রামের গোপন পাসওয়ার্ড ভেঙ্গে লুকানো সব তথ্য পড়ে ফেলতে পারতেন। এক সময় তিনি দু'জন হ্যাকারকে সঙ্গে নিয়ে 'ইন্টারন্যাশনাল সাবভারসিভস' নামে একটি গ্রুপ গঠন করেন। কানাডার টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী নরটেলসহ ২৪টি প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষিত কম্পিউটার নেটওয়ার্কে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে পুলিশ তাকে পাকড়াও করে। নিজের ভুল স্বীকার করে কয়েক হাযার ডলার জরিমানা দিয়ে মুক্তি পান অ্যাসাঞ্জ। বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করে ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে তিনি এ ধারণায় পৌঁছান যে, **সব সরকার ও ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠান মিথ্যা বলে এবং জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করে। সরকার মাত্রই ষড়যন্ত্রপ্রবণ।** অ্যাসাঞ্জ মনে করেন, **ষড়যন্ত্রকারীদের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে গোপনীয়তা। গোপনীয়তা ভেঙে দিতে পারলেই ষড়যন্ত্র ভণ্ডুল করা সম্ভব।** এ রকম ভাবনা বা দর্শন থেকেই তিনি ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে চালু করেন 'উইকিলিক্স' নামের ওয়েবসাইট, যার কাজই হবে জনগুরুত্বপূর্ণ গোপন নথিপত্র বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ করা। উইকিলিক্সের কোন স্থায়ী অফিস নেই। কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরা সবাই মোটের ওপর গুপ্ত জীবন যাপন করেন বাধ্য হয়ে। অ্যাসাঞ্জ ছাড়াও উইকিলিক্সের পাঁচজন নিয়মিত ও ৮০০ অনিয়মিত কর্মী রয়েছে। উইকিলিক্সের তথ্যগুলো মাটির ১০০ ফুট নিচে গ্রানাইটের ঢালাই দেয়া সুরক্ষিত স্থানে সংরক্ষণ করা হয়েছে। পরমাণু বোমা ফেলেও স্থানটিকে ধ্বংস করা যাবে না এবং তার তথ্যাবলী বিশ্বজুড়ে ২০টিরও বেশী সার্ভারে এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যে, কোন হ্যাকার তা নষ্ট করতে পারবে না এবং এটাকে ধ্বংস করতে হ'লে সারা বিশ্বের সমস্ত ইন্টারনেট ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করতে হবে।

উইকিলিক্সের তথ্য

আমেরিকার চাপে তুরাছের কার্যক্রম স্থগিত করে বাংলাদেশ সরকার

মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের জঙ্গী অর্থায়ন ও আর্থিক অপরাধ বিষয়ক সহকারী সচিব প্যাট্রিক ওব্রিয়েন 'জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছিল ইসলামী' (রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি-আরআইএইচএস)-এর কর্মকাণ্ড নিয়ে ২০০৭ সালের মে মাসে কুয়েতের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে তিনি এ সংস্থাটি নিয়ে বিশেষ করে বাংলাদেশে এর কর্মকাণ্ড নিয়ে মার্কিন সরকারের উদ্বেগের কথা জানান। উহকিলিক্সের ফাঁস করা মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের এ সংক্রান্ত এক তারবার্তায় বলা হয়, কুয়েতে ঐ বৈঠকে বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশে এই সংস্থার শাখাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সুফারিশ করেন প্যাট্রিক ওব্রিয়েন। তারবার্তায় বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র সরকার কুয়েতী এই সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার বিরুদ্ধে জঙ্গীদের অর্থায়ন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনলেও বাংলাদেশের বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। ২০০৬ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ সরকার আরআইএইচএসের নিবন্ধন আরও পাঁচ বছরের জন্য নবায়ন করে। কিন্তু অবশেষে মার্কিন চাপে বাংলাদেশ সরকার সংস্থাটির কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

[কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, ২০০৫ সালের ১৩ই রামাযানে এই সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত পৌণে আটশ' ইয়াতীমের রূযি তাহলে কেন বন্ধ করে দিলেন তৎকালীন সরকার? পিতৃ-মাতৃহারা এইসব অসহায় ইয়াতীমগুলি যদি পরে রূযির তাকীদে কোন অন্যায় পেশায় লিপ্ত হয়, তার দায়-দায়িত্ব কে নিবে? এছাড়া এদেশে কর্মরত প্রায় ৫৫ হাযার এন-জিওর অধিকাংশ যেখানে সূদের মাধ্যমে গরীবের রক্ত চুষে খাচ্ছে, সেখানে এই এনজিওটি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে এদেশে অসংখ্য মসজিদ-মাদরাসা-ইয়াতীমখানা, নলকূপ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনসহ বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছিল। তাদের উপর কেন এই মিথ্যা অপবাদ চাপানো হ'ল? সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যায় চাপের কাছে মাথা নত করাই কি তাহ'লে এদেশের নির্বাচিত সরকারগুলির দায়িত্ব? স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও কি দেশ আজও পরাধীন? মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন (স.স.)]

ভারতে টিভি সিরিয়াল দেখে বিগড়ে যাচ্ছে নতুন প্রজন্ম

ভারতে একটি জাতীয়ভিত্তিক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, সন্ধ্যা সাতটা থেকে দশটার মধ্যে যে সিরিয়াল বা টিভি অনুষ্ঠান দেখানো হয় তাতে বিগড়ে যাচ্ছে ৬ থেকে ১৭ বছরের ছেলে-মেয়েরা। এই মত ব্যক্ত করেছেন অন্তত ৯০ শতাংশ অভিভাবক। তারা বলেছেন, যত দিন যাচ্ছে ততই শালীনতা হারাচ্ছে এসব অনুষ্ঠানের সংলাপ এবং ছবি। ভারতীয় মনস্তত্ত্ববিদরা বলেছেন, এই টিভি দেখার প্রভাবে ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠছে কম বয়সী ছেলেমেয়েরা। ফলে মা-বাবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেও তারা পিছু পা হচ্ছে না।

মুসলিম জাহান

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঊদী পরিকল্পনা

সঊদী আরব আগামী ১০ বছরের মধ্যে পারিমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করেছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি হিসাবে মূল্যবান তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প হিসাবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সঊদী সরকার। উল্লেখ্য সঊদী আরব ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বেসামরিক পারমাণবিক প্রযুক্তি সহযোগিতা বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং গত বছর ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গেও অনুরূপ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

মার্কিন নৃশংসতার শিকার পাকিস্তানী নিওরোলোজিস্ট ড. আফিয়া ছিদ্দীকী

মার্কিন নির্মমতা ও নৃশংসতার শিকার হার্ভাড ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রীধারী নিওরোলোজিস্ট ড. আফিয়া ছিদ্দীকী। ২০০৩ সালের মার্চ মাসে তিন সন্তানসহ করাচী থেকে রাওয়ালপিন্ডি যাবার পথে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের সহায়তায় মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা 'এফবিআই' তাকে অপহরণ করে আফগানিস্তানে মার্কিনীদের বাগরাম বিমানঘাঁটিতে বন্দী করে রাখে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় ১৪৪টি অনারারী ডিগ্রী ও সার্টিফিকেটের অধিকারিণী কুরআনের হাফেযা ড. আফিয়ার উপর তখন থেকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতে থাকে মার্কিন প্রশাসন। মার্কিন সৈন্যরা তাকে ক্রমাগত ধর্ষণ করে। ইভোননি রিডলী লিখেছেন, 'অসহায় এই নারীর আর্তচিৎকার বন্দীশালার দেয়ালে দেয়ালে এমন ভয়াবহভাবে প্রতিধ্বনিত হয় যে, শেষ পর্যন্ত অন্যান্য কয়েদীরা এর প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট করে'। অপহরণের দীর্ঘদিন পর ২০০৮ সালে 'এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন'-এর এক নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হ'লে বিষয়টি বিশ্ববাসীর নজরে আসলে মার্কিন কর্তৃপক্ষ এক নতুন গল্প তৈরী করে। আল-কায়েদার সাথে তার জড়িত থাকার অভিযোগ এনে দাবী করে যে, আফিয়াকে নাকি আফগান সৈন্যরা গজনী প্রদেশের বাইরে বিস্ফোরক প্রস্তুতকারক ম্যানুয়াল এবং বিপদজনক দ্রব্যসহ আটক করে আর তখন কোন এক মার্কিন সৈন্যের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তিনি নাকি মার্কিন সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে গুলি ছোঁড়ে। যদিও তাতে কেউ আহত বা নিহত হয়নি। ২০০৮ সালের জুলাই থেকে আফিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারে বন্দী রয়েছেন। ২০০৮ সালের ৭ আগষ্ট 'দ্য নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে আফিয়ার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানা গেছে যে, তার একটি কিডনী অপসারণ করা হয়েছে, দাঁতগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে এবং নাক ভেঙ্গে সেটিকে আবার যেনতেনভাবে জোড়া লাগানো হয়েছে। আর মার্কিন সেনাদের গুলির আঘাতে তার শরীরে যে ক্ষত সৃষ্ট হয়েছে চিকিৎসা না হবার কারণে সেখান থেকে ক্রমাগত পুঁজ আর রক্ত পড়ছে। এভাবে মার্কিন সন্ত্রাসের শিকার সুন্দরী আফিয়া স্মৃতিশক্তি হারিয়ে রীতিমত উন্মাদে পরিণত হয়েছে। তার বিকৃত চেহারা দেখে তাকে চেনার উপায় নেই। তার সন্তানদের কোন হদিস এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এখন তাকে খাবার প্রদান করলে সে জেলখানার কর্মচারীদের বলে, তারা আফিয়ার প্লেট থেকে কিছু খাবার নিয়ে যেন আফগানিস্তানে তার সন্তানদের কাছে পৌঁছে দেয়। এরপরও পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ মুখে কুলুপ এঁটে আছে কেন-তা ভাবার বিষয়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

এক গ্রাসেই দুইশ' মানুষের খাবার খায় নীল তিমি!

পৃথিবীর বৃহত্তম স্তন্যপায়ী প্রাণী নীল তিমি সাগরের গভীর পানিতে যখন এঁকেবেঁকে সামনের দিকে চলতে থাকে তখন এক গ্রাসেই এত মাছ খেয়ে ফেলতে পারে, দুইশ' মানুষের পক্ষেও সেই পরিমাণ মাছ খাওয়া সম্ভব নয়। এমনকি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকা অবস্থায়ও এরা খেতে পারে রাশি রাশি মাছ। প্রতি কামড়ে কতগুলো মাছ গ্রোগ্রাসে গিলতে পারে তার হিসাব কষে গবেষকরা দেখেছেন, এরা একসঙ্গে ৮ হাযার ৩০৬ ক্যালরি থেকে শুরু করে ৪ লাখ ৫৬ হাযার ৮৩৫ ক্যালরি পর্যন্ত খেতে পারে। এরা সর্বোচ্চ যে পরিমাণ খেতে পারে তা দিয়ে ২২৮ জনেরও বেশী মানুষকে প্রতিদিন ২ হাযার কিলো ক্যালরি খাবার খাওয়ানো যেতে পারে। গবেষকরা দেখেছেন, তিমিকে কেবল একবার এর শরীর নড়াচড়া করতেই নিঃশেষ করতে হয় ৭৭০ কিলো ক্যালরি। কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এমন তথ্য দিয়েছেন।

বিমানবন্দরে বিস্ফোরক শনাক্ত করণের যন্ত্র আবিষ্কার, কৃতিত্ব বাংলাদেশী বিজ্ঞানীর

বিশ্বের বিভিন্ন এয়ারপোর্টসহ নিরাপত্তা এলাকাগুলোতে যখন দেহতল্লাশী নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক চলছে, তখন ড. আনিসুর রহমান আবিষ্কার করেছেন একটি বিস্ময়কর প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের শরীরে বিস্ফোরক জাতীয় কোন উপাদান থাকলে সেটা এমনিতেই ধরা পড়ে যাবে। এজন্য বর্তমানের এক্সরে মেশিনের প্রয়োজন হবে না। ড. আনিসুর রহমানের এ প্রযুক্তি যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটি বিভাগ এরই মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। এ বিষয়ে ড. আনিসুর রহমান বলেন, বর্তমান সময়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে সারা বিশ্বে বিলিয়ন্স অব ডলার খরচ করা হচ্ছে। মেটালিক কোন বিস্ফোরক হ'লে সেটা যেকোন জায়গাতেই ধরা পড়ে। কিন্তু এখন বিভিন্ন কেমিক্যাল পাউডারসহ রাসায়নিক বিস্ফোরকের ব্যবহার প্রতিদিনই বাড়ছে। এই মেশিন একটি টেবিলে বসানো সম্ভব। এর ফলে কেউ রাসায়নিক বিস্ফোরক নিয়ে নিরাপত্তা এলাকায় প্রবেশ করতে পারবে না। মেশিনটির নাম দেয়া হয়েছে 'স্পেকট্রোমিটার'। এর আরও অনেক প্রয়োগ আছে। তিনি বলেন, বেশী বা খুবই অল্প বিস্ফোরক হ'লেও এর চোখ এড়ানো সম্ভব হবে না। ড. আনিসুর রহমানের বাড়ি বাংলাদেশের পাবনায়। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনে তিনি এক সময় সায়েন্টিফিক অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইউসকনসিনে অবস্থিত মার্কেট ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভের পর পেনসিলভেনিয়ার এপ্লায়েড রিসার্চ ফটোনিক্স কোম্পানির সিইও হিসাবে যোগদান করেন তিনি।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন

অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে কোন নির্যাতনকে পরোয়া করবেন না

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

কানসাট, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন কানসাট রাজবাড়ী মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, কানসাটের অদূরে নারায়ণপুরের রফী মোল্লা শিরক-বিদ'আত সহ যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে এদেশের মানুষকে কুরআন ও হাদীছের পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। এ কারণেই তাকে বৃটিশ সরকার ১৮৫৩ সালে মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর জেলখানায় বন্দী করে রেখেছিল। কিন্তু হকের দাওয়াত থেকে তিনি এক চুল পরিমাণও সরে যাননি। পরে তাঁর ছেলে মৌলবী আমীরুদ্দীন পিতার এ দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। বেদ'আতী ফকীর ও গ্রাম্য মাতব্বরদের চক্রান্তে ওয়াহহাবী নামে অভিহিত হয়ে তিনি গ্রেফতার হন এবং বিচারে ফাঁসির আদেশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাতে আলহামদুল্লিাহ বলায় তাকে আন্দামানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড দেওয়া হয় এবং সমস্ত সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত করা হয়। ১৮৭২ সালের মার্চ থেকে ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত প্রায় ১১ বছর রাফ'উল ইয়াদায়েন করে ছালাত আদায় করলে তাকে নির্বাসনে কাটাতে হয়। একইভাবে রাফ'উল ইয়াদায়েন করে ছালাত আদায় করে ওয়াহহাবী হিসাবে ধরা পড়ার ভয়কে উপেক্ষা করে শিয়ালকোটের (পাকিস্তান) জুম'আ মসজিদে ধরা পড়ার পরে সাতক্ষীরার মার্জুম হোসেনকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয়েছিল। কিন্তু তিন তিন বার ফাঁসির দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ায় ভীত হয়ে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। সেদিন যেকোন মূল্যে সুন্নাতের উপর দৃঢ় থাকার কারণে ও হক্বের দাওয়াত দেওয়ার কারণে রফী' মোল্লা, আমীরুদ্দীন ও মার্জুম হোসেনকে ওয়াহহাবী জঙ্গী আখ্যায়িত করে নির্যাতন করা হয়েছিল। আজও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর নেতা-কর্মীদেরকে একই কারণে মিথ্যা অপবাদে সরকারের হাতে নির্যাতিত হ'তে হচ্ছে। তিনি সমবেত বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সকলে ঐক্যবদ্ধ হউন। এজন্য কোন অপবাদ ও নিপীড়নকে পরোয়া করবেন না।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, স্থানীয় মোবারকপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুবিনুর রহমান ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জর্জকোর্টের এ্যাডভোকেট শহীদুল ইসলাম প্রমুখ। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম এবং প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছই অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

তেরখাদা, খুলনা ৬ ডিসেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার তেরখাদা উপযেলা শহরের ইখড়ি-কাঠেংগা হাইস্কুল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা যেলার তেরখাদা এলাকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বিগত দিনে প্রসিদ্ধ চার ইমামের উপরে সরকারী নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা শেষে বলেন যে, সে যুগে সরকারের লেজুড় আলেমদের চক্রান্তে পড়েই তাঁরা সরকারের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। আজও সেক্যুলার ও পপুলার ইসলামীদের জোট সরকার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর নেতা-কর্মীদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ চার ইমামের বক্তব্য ছিল একটাই যে, 'যখন তোমরা ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনে রেখ সেটাই আমাদের মাযহাব'। এতেই দুনিয়া পূজারীরা ক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পরে তাদের নাম ভাঙিয়ে দুনিয়াদার লোকেরা দলাদলিতে লিপ্ত হয়। এতে তারা দুনিয়াতে কিছু লাভবান হ'লেও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদিও ইমামদের আদর্শ তাদের মধ্যে বলতে গেলে কিছুই নেই। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ছাহাবাযুগ থেকে চলে আসা সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বলা হয়। শেষনবী ছিলেন বিশ্বনবী। তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন ও হাদীছ বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত এলাহী বিধান। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' তাই কোন গোষ্ঠীগত আন্দোলন নয়, বরং এটি বিশ্ব মানবতার মুক্তি আন্দোলন। তিনি বলেন, তওরাত, যবূর, ইঞ্জীল পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু কুরআন রয়েছে পরিবর্তনের যাবতীয় সন্দেহের ঊর্ধ্বে। কারণ কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন। এই কুরআন গবেষণা করেই অনেক খৃষ্টান বিজ্ঞানী ইসলাম কবুল করেছেন। আজকে আমাদেরকেও অভ্রান্ত সত্যের উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমাদের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে হবে। তাহ'লেই আমাদের ইহকাল ও পরকালে সফলতা অর্জিত হবে। তিনি উপস্থিত সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (ঢাকা), রূপসা-পূর্ব এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও চাঁদপুর দাখিল মাদরাসার সহ-সুপার মাওলানা মামূনুর রশীদ ও জুনারী দাখিল মাদরাসার সহ-সুপার মাওলানা আব্দুর রহীম প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

উত্তর বঙ্গের তিনটি প্রসিদ্ধ মাদরাসায় আমীরে জামা'আতের পক্ষ হ'তে হাদিয়া প্রদান

উত্তরবঙ্গের নওগাঁ যেলাধীন সাপাহার থানার তিনটি প্রসিদ্ধ কওমী মাদরাসায় মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পক্ষ থেকে কিছু হাদিয়া নিয়ে গত ৭ই ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠান সমূহে গমন করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। তার সফরসঙ্গী ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, সহ-পরিচালক গোলাম কিবরিয়া, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক মাওলানা ফযলুল করীম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ, নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন ও নওগাঁ যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আফযাল হোসাইন প্রমুখ।

সকাল সাড়ে ৮-টায় রাজশাহী থেকে মাইক্রোযোগে রওয়ানা হয়ে প্রথমে তারা **আলাদীপুর** দারুল হুদা সালাফিইয়া মাদরাসায় গমন করেন এবং মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব হাটহাজারী-এর নিকট প্রিন্টার, ইউপিএস সহ একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার সেট উপহার হিসাবে প্রদান করেন। সেই সাথে একটি আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ্র সিডি প্রদান করা হয়। যেখানে তাফসীর, তারীখ, হাদীছ, ফিক্বহ প্রভৃতির প্রায় ১১ হাযার অমূল্য গ্রন্থের সংগ্রহ রয়েছে। শিক্ষক ও ছাত্রগণ এসব সংগ্রহ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সমূহ জেনে নিতে পারবেন। অতঃপর মাদরাসা সংলগ্ন মসজিদে সমবেত ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে মেহমানগণ বক্তব্য পেশ করেন।

বাদ যোহর তাঁরা আলাদীপুর হ'তে অন্যূন ১০ কিলোমিটার দূরবর্তী **কদমডাংগা** ইসলামিয়া আরাবিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সেখানে অপেক্ষমান উক্ত মাদরাসার শিক্ষক মণ্ডলী ও কমিটির সদস্যগণ তাদেরকে স্বাগত জানান। অতঃপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে আত-তাহরীক সম্পাদক সকলকে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সালাম পৌঁছে দেন এবং মাদরাসার ভবন নির্মাণ বাবদ কিছু নগদ অনুদান কমিটির সভাপতি জনাব হায়াত আলী মাষ্টার-এর নিকট প্রদান করেন। এ সময়ে মসজিদে সমবেত ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যেও মেহমানগণ বক্তব্য পেশ করেন।

সেখান থেকে বিকাল ৪-টায় রওয়ানা হয়ে মাগরিবের সময় তারা দেশের সর্ব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সংলগ্ন **কলমুডাংগা** দারুল উলূম সালাফিইয়াহ মাদরাসায় গমন করেন। সেখানে মাদরাসার অফিস কক্ষে কমিটির সদস্য বৃন্দ ও শিক্ষক মণ্ডলীর সাথে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আত-তাহরীক সম্পাদক মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সালাম পৌঁছে দেন এবং অত্র প্রতিষ্ঠানে যেন ইলমে হাদীছের দারস ও তাদরীস ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকে, সে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। অতঃপর তিনি মাদরাসার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার সেট মুহতামিম জনাব আব্দুল হাকীম-এর হাতে তুলে দেন। অতঃপর মসজিদে সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় মেহমানগণ উপদেশমূলক বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর বাদ মাগরিব তারা রাজশাহীতে রওয়ানা হন।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত তিন মাদরাসারই স্বনামধন্য সাবেক শিক্ষক ও আমৃত্যু আলাদীপুর মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা শামসুদ্দীনের জানাযায় অংশগ্রহণ শেষে গত ২৩ অক্টোবর শনিবার মুহতারাম আমীরে জামা'আত অত্র মাদরাসাগুলি পরিদর্শন করেন এবং নিভৃত পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত ইলমে হাদীছের এই দরসগাহ গুলি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। অতঃপর তারই ধারাবাহিকতায় তিনি মাদরাসাগুলিতে যৎসামান্য উপঢৌকন প্রেরণ করেন।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগ উদ্বোধন

গবেষণা বিভাগ শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণে কাজ করবে

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

রাজশাহী, ১ ডিসেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর দারুল ইমারত আহলেহাদীছ নওদাপাড়া, রাজশাহীতে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর উন্নতি-অগ্রগতির মূলে দু'টি কারণ রয়েছে। একটা মানুষের নিজস্ব প্রচেষ্টা এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা, যা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে হয়েছে। এ পৃথিবীতে জ্ঞানে, বোধশক্তিতে আল্লাহ কাউকে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। এমনকি নবী-রাসূলদের মধ্যেও আল্লাহ কাউকে মর্যাদায় উচ্চ করেছেন। তিনি বলেন, পৃথিবীতে দুইভাবে পরিবর্তন হয়েছে; নবুয়াত ও রেসালাতের মাধ্যমে এবং মানুষের দ্বারা সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে। তিনি বলেন, অমুসলিম পণ্ডিতগণ, যাদের কাছে অহি-র আলো ছিল না, তারা নিজেদের আলো দ্বারা মানুষের কল্যাণ করতে চাইতেন। যেমন এরিষ্টটল, প্লেটো, আইনষ্টাইন প্রমুখ। তারা নিজেদের জ্ঞানের আলোকে পৃথিবীর কল্যাণ করতে চেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে মুসলমানরা চেয়েছেন নিজেদের জ্ঞানের সাথে অহি-র জ্ঞান যোগ করে পৃথিবীকে আলোকিত করতে। যেমন আমরা খোলাফায়ে রাশিদার আমলে দেখেছি।

তিনি বলেন, হাদীছ ফাউণ্ডেশনের গবেষণা বিভাগকে বর্তমান যুক্তি ও বিজ্ঞানের মোকাবিলা করতে হ'লে হাদীছের মাধ্যমেই করতে হবে। গবেষণা বিভাগের সামনে মৌলিক কয়েকটি বিষয় থাকতে হবে। আহলুর রায়রা তাদের বিগত দিনের ইমামদেরকে তাদের গবেষণার সামনে রাখে। সেক্যুলাররা তাদের জ্ঞানীদের সামনে রাখে। কিন্তু আহলেহাদীছ গবেষকদের সামনে থাকবে কুরআন, হাদীছ ও মুহাদ্দিছীনের মাসলাক। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে এমনকি উপমহাদেশে কোন সংগঠনের কোন গবেষণা বিভাগ নেই, যা আজ 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র হয়েছে। সুতরাং এ বিভাগের গবেষকদেরকে দুনিয়ার সকলের কল্যাণে কাজ করতে হবে।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর সচিব অধ্যাপক আব্দুল লতীফ 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, দফতর সম্পাদক হারূনুর রশীদ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, সোনামণির কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, নওদাপাড়া

মাদরাসার সহকারী শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী, ফযলুল করীম হাফেয লুৎফর রহমান, শামসুল আলম মুফাক্কার হোসেন, হাফেয মাসুদ ও গবেষণা বিভাগের জন্য সদ্য নিয়োগকৃত গবেষকবৃন্দ।

যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কর্মী প্রশিক্ষণ

রাজশাহী ২৩, ২৪, ২৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার : গত ২৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বাদ আছর হ'তে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর 'তিন দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কর্মী প্রশিক্ষণ ২০১০' শুরু হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক ফারূক আহমাদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ, তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার হেফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান প্রমুখ। তিন দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি 'যুবসংঘে'র বিগত দিনের ইতিহাসের উপরে কর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এতে বহু অজানা তথ্য জানতে পেরে কর্মীগণ দারুণভাবে উজ্জীবিত হন। দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, অহি-র দাওয়াত দিতে গেলে বিভিন্ন বাধা আসবে। সেসকল বাধাকে ঈমানী শক্তি নিয়ে পেরিয়ে যেতে হবে। কোন যুলুম-নির্যাতনের ভয়ে হক-এর দাওয়াত হ'তে পিছিয়ে থাকা যাবে না। তিনি কর্মীদেরকে যে কোন মূল্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালিত এ মহান সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম (রাজবাড়ী) ১ম স্থান, মুহাম্মাদ যুবায়েদ আলী (কুমিল্লা) ২য় স্থান ও মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (ঢাকা) ৩য় স্থান অধিকার করেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ও দো'আ করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও সাবেক সভাপতি ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ।

ইবতেদায়ী সমাপনী ও জেডিসি পরীক্ষায় নওদাপাড়া মাদরাসার সাফল্য; সমাপনীতে ১০ম স্থান অধিকার

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন ২০১০ সালের ৫ম শ্রেণীর ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী ও প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত ৮ম শ্রেণীর দাখিল জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ছাত্ররা শতভাগ পাশের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় ৫৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৭ জন ১ম বিভাগে, ৪ জন ২য় বিভাগে এবং ২ জন ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে আব্দুল মুহায়মিন (বগুড়া) সর্বমোট ৬০০ নম্বরের মধ্যে ৫৭০ পেয়ে রাজশাহী মহানগরীতে ১ম ও সারাদেশে মেধা তালিকায় ১০ম স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করেছে। এছাড়া অন্য যে ৭ জন বৃত্তি পেয়েছে তারা হ'ল- সুলতানা আক্তার (রাজশাহী, ১১তম), আমীনুল ইসলাম (ঝিনাইদহ, ১৫তম), মঈনুদ্দীন (রাজশাহী, ১৭তম), ওমর ফারূক (নওগাঁ, ২০তম), সাইফুল ইসলাম (রংপুর, ২১তম), আব্দুর রাকীব (রাজশাহী, ২২তম) ও আসাদুল্লাহ আল-গালিব (কুষ্টিয়া, ২৫তম)।

অন্যদিকে ৮ম শ্রেণীর জেডিসি পরীক্ষায় ৩৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১জন A+, ২৩ জন A, ৭ জন A-, ১ জন B ও ১ জন C গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে একমাত্র আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া) A+ পাওয়ায় কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

(২) দারুল হাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ

ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী ও জেডিসি পরীক্ষায় দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ্র (বাঁকাল, সাতক্ষীরা) ছাত্ররা শতভাগ পাশের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় ১৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯ জন ১ম বিভাগ ও ১০ জন ২য় বিভাগ পেয়েছে। এদের মধ্যে বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্ররা হচ্ছে ছাকিব ইমতিয়ায (ইটাগাছা, সাতক্ষীরা; যেলায় ৯ম), আসিফ (১১তম), মওদূদ হোসেন (তালা, ১৬তম) ও সাইফুল্লাহ (পায়রাডাঙ্গা, ১৭তম)। অন্যদিকে ৮ম শ্রেণীর জেডিসি পরীক্ষায় ১৮জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন A+, ২ জন A, ৪ জন A-, ৮ জন B ও ৩ জন C গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে বুরহানুদ্দীন (তালা, সাতক্ষীরা) জিপিএ-৫ এবং নাঈমা ছিদ্দীকা (বুলারাটি) জিপিএ-৪ (৪.৬১) ও হাবীবুল্লাহ জিপিএ-৪ (৪.২৮) পেয়েছে।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদ শরীফ লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৭ ডিসেম্বর বিকাল ৩-টায় ঢাকার হাতীরপুলের ব্রাইটন হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪২ বছর। তিনি ১ ছেলে, ১ মেয়ে, স্ত্রী ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। ২৮ ডিসেম্বর সকাল সোয়া ১১-টায় জগৎপুর ঈদগাহ ময়দানে তার ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন তার ভগ্নিপতি ও নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক হাফেয অহীদুয্যামান। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা ছফিউল্লাহ এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ সহ জগৎপুর মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক ও এলাকার জনগণ অংশগ্রহণ করেন। তাকে জগৎপুরে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

(২) মাসিক আত-তাহরীক-এর কম্পিউটার অপারেটর যিয়াউর রহমানের মাতা মুসাম্মাৎ রহীমা বেগম (৬৬) গত ১৭ ডিসেম্বর শুক্রবার সকাল ৯-১৫মিনিটে সাতক্ষীরার স্বপ্না ক্লিনিকে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ...*। বাদ জুম'আ নিজ গ্রাম বুলারাটিতে (সাতক্ষীরা সদর) তাঁর ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র যিয়াউর রহমান জানাযায় ইমামতি করেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

[আমরা তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। - সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১২১):* ঢাকার একটি পুরাতন মাসিক ইসলামী পত্রিকার অক্টোবর ২০১০ সংখ্যায় প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, মৃত ব্যক্তি বা প্রিয় নবী (ছাঃ)-এর নামে নফল নামায পড়া শুধু জায়েযই নয়, বরং অনেক ভাল কাজ। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-বদীউযযামান
কামালনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ কেউ কারু জন্য ছালাত আদায় করতে পারে না। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, কেউ কারো পক্ষ থেকে ছিয়াম পালন করতে পারে না এবং কেউ কারো পক্ষ থেকে ছালাত আদায় করতে পারে না *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/২০৩৫)*। তবে মানতের ছিয়াম একজন অন্য জনের পক্ষ থেকে পালন করতে পারে *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৮; বায়হাক্বী ৪/২৫৫)*।

প্রশ্ন (২/১২২) : প্রতিদিন সূরা ইখলাছ ২০০ বার পড়লে ৫০ বছরের পাপ ক্ষমা হয়ে যায়। শুধু ঋণ মাফ হয় না হাদীছটি কি ছহীহ?

-মতীউর রহমান
আত্রাই ডিগ্রী কলেজ
কেশরহাট, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/২৮৯৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩০০; মিশকাত হা/২১৫৮)*। তবে সূরা ইখলাছ পাঠের অনন্য ফযীলত রয়েছে। যেমন- রাসূল (ছাঃ) বলেন, সূরা ইখলাছ একবার পড়লে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠের সমান নেকী পাওয়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৭ 'কুরআনের ফাযায়েল' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩/১২৩) : আছরের পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কোন ক্বাযা ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুল বাছীর
রশীদপাড়া, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : কোন ফরয ছালাত ছুটে গেলে যখন স্মরণ হবে তখন আদায় করে নিবে। কারণ ফরয ছালাত আদায়ের ব্যাপারে বিলম্বের কোন সুযোগ নেই। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি ছালাত পড়তে ভুলে যায় অথবা ছালাত রেখে ঘুমিয়ে যায়, তাহ'লে তার কাফফারা হচ্ছে যখন স্মরণ হবে তখন আদায় করে নিবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৩)*।

প্রশ্ন (৪/১২৪) : সম্প্রতি ইরানী মেয়েরা বাংলাদেশে এসে হিজাব পরে ফুটবল খেলে গেল। মেয়েদের জন্য এই খেলা কি বৈধ?

-আলে ইমরান
কোর্টবাড়ী, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : নারীদের জন্য এসব খেলা সর্বাবস্থায় হারাম। এসব খেলা নারীদের স্বাস্থ্য, স্বভাব ও মর্যাদার বিরোধী। আল্লাহ তাদেরকে বাড়ীতে থাকার নির্দেশ দান করেছেন *(আহযাব ৩৩)*। তিনি বলেন, মেয়েরা যেন এমনভাবে পা না ফেলে, যা তাদের গোপন সৌন্দর্য অন্যকে জানিয়ে দেয়' *(নূর ৩১)*। পর পুরুষের সামনে মেয়েদের খেলা-ধুলা, নাচ-গান ও শারীরিক কসরৎ সবই আল্লাহ্র উক্ত আদেশের বিরোধী। যা কেবল হিজাব পরলেই দূর হয় না। অতএব এসব থেকে আল্লাহভীরু মেয়েদের দূরে থাকতে হবে। এরপরেও যখন তা টিভি পর্যায় বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়, তাতে পাপের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন (৫/১২৫) : অনেকের মুখে শুনা যাচ্ছে কুরআনের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূলের দাড়ি পাওয়া যাচ্ছে। এটা কি কোন অলৌকিক ঘটনা?

- আব্দুল বাকী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : এটা অলৌকিক কোন ঘটনা নয়; বরং মিথ্যা গুজব মাত্র। কুরআন মাজীদে দাড়ি-চুল পাওয়া যেতেই পারে। কারণ মানুষ কুরআন পড়ে এবং প্রেস থেকে বের হওয়ার পর মানুষই তা বাঁধাই করে।

প্রশ্ন (৬/১২৬) : ইবরাহীম (আঃ) আমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম। প্রশ্ন হ'ল, পূর্বের নবী-রাসূলগণের অনুসারীদের নাম কী ছিল?

-জালালুদ্দীন
কাশেম বাজার, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : শুধু আমাদের নামই মুসলিম নয়; বরং সকল নবীর উম্মতের নাম ছিল মুসলিম। আল্লাহ তা'আলা তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদের নাম রেখেছেন মুসলিম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এবং জিহাদ কর আল্লাহ্র পথে যেভাবে করা উচিত; তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি; এটা

তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। পূর্ব হতেই তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম' *(হজ্জ ৭৮)*।

উল্লেখ্য, ইবরাহীম (আঃ) আমাদের নাম 'মুসলিম' রেখেছেন মর্মে যে কথা চালু আছে তা সঠিক নয়। আয়াতে উল্লেখিত 'হুয়া' সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্কে বুঝানো হয়েছে যেমন পূর্বের 'হুয়া' দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ হ'ল, আল্লাহ তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' হিসাবে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে এবং এই কিতাবে (অর্থাৎ কুরআনে)। *(তাফসীরে ইবনে কাছীর উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। তবে এ নাম হ'ল আক্বীদা ও আদর্শগত। কেননা আক্বীদাগতভাবে বিশ্বের সকল মানুষ মূলতঃ দু'ভাগে বিভক্ত মুসলিম ও কাফির *(তাগাবুন ২)*। মুসলিমগণ আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং কাফিরগণ অবিশ্বাসী। এরপরেও মূসা ও ঈসার উম্মতকে আল্লাহ ইয়াহূদ ও নাছারা হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে মুহাজির ও আনছারদেরকে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যগত নামে আল্লাহ প্রশংসা করেছেন *(তওবা ১০০)*। একইভাবে অনন্য বৈশিষ্ট্যগত কারণে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) পরবর্তী বংশধরগণকে 'আহলুল হাদীছ' নামে প্রশংসা করেছেন *(হাকেম ১/৮৮ প্রভৃতি; ছাহীহাহ হা/২৮০)*। আর এসব নাম মূলত: পরিচিতির জন্য *(হুজুরাত ১৩)*। তবে বস্তুতঃ সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যিনি সর্বাধিক আল্লাহভীরু *(হুজুরাত ১৩)*।

প্রশ্ন (৭/১২৭) : মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে কোন ছালাত আদায় করব? 'তাহিইয়াতুল ওযূ' না 'দুখূলুল মসজিদ'?

- সফিউদ্দীন
নরসিংদী।

উত্তর : যে ছালাতের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা হয়েছে সেই ছালাতের সুন্নাত থাকলে সেই সুন্নাত পড়তে হবে। আর সেই ছালাতের কোন সুন্নাত না থাকলে দুখূলুল মসজিদ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০৪; ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৩৫৮)*। তারপর সময় পেলে তাহিইয়াতুল ওযূ পড়তে পারে। অবশ্য এই তাহিইয়াতুল ওযূ শুধু ছালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। যখন ওযূ করবে তখনই পড়তে পারবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩২৬, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৮/১২৮) : নিষিদ্ধ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে দুখূলুল মসজিদ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-রফীকুল ইসলাম
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তর : যেকোন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে তাহিইয়াতুল মসজিদ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করে মসজিদে বসতে নিষেধ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০৪)*।

প্রশ্নঃ (৯/১২৯): শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালন করার পর বিভিন্ন স্থানে মিষ্টি মুখ করে ঈদ পালন করা হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-সুমাইয়া
গণবিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : এটা শরী'আতের নামে নতুন আবিস্কার, যা পরিত্যাজ্য। নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি এমন আমল করে যার ব্যপারে আমার কোন নির্দেশনা নেই, তা পরিতাজ্য' *(বুখারী ২/১০৯২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১০/১৩০) : মসজিদের মাইকে আযান ব্যতীত অন্য কোন ঘোষণা দেয়া যাবে কি? যেমন মৃত সংবাদ, হারানো বিজ্ঞপ্তি, সরকারী ঘোষণা, চিকিৎসার ঘোষণা ইত্যাদি।

-আব্দুল করীম
বড়গাছী, রাজশাহী।

উত্তর : মসজিদে আযান ব্যতীত অন্য কোন ঘোষণা না দেওয়াই উচিত। যেমন হারানো বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কেউ মসজিদে হারানো বিজ্ঞপ্তি শুনলে সে যেন বলে আল্লাহ যেন তোমাকে জিনিষটি ফেরত না দেন। কারণ এ কাজের জন্য মসজিদ বানানো হয়নি *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৬)*। অনুরূপ মৃত সংবাদও প্রচার করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(ছহীহ তিরমিযী হা/৯৮৬)*। সরকারী ঘোষণা ও চিকিৎসার ঘোষণার সাথে মসজিদের কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন (১১/১৩১) : কোন বিষয়ে আল্লাহ্র কাছে বিচার দেয়ার পর পুনরায় সে বিষয়ে মানুষের কাছে বিচার চাওয়া যাবে কি?

-রুবীনা খাতুন
দর্শনহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : এমতাবস্থায় অন্যের কাছে বিচার না চাওয়াই ভাল। কারণ যারা সঠিক পথে থাকে তাদের পক্ষ থেকে ফেরেশতারা প্রতিবাদ করেন। আর সঠিক পথের ব্যক্তি যদি প্রতিবাদ করতে যায় তাহ'লে ফেরেশতা সরে যান *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫১০২; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৩১)*।

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একজন লোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার কিছু প্রতিবেশী রয়েছে আমি তাদের সাথে সদাচরণ করি। কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে

ভাল আচরণ করি। কিন্তু তারা আমার সাথে মন্দ আচরণ করে। আমি তাদের সাথে নরম ও ধৈর্যশীল হতে চাই। কিন্তু তারা আমার সাথে রুক্ষতা প্রকাশ করে।

জবাবে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তুমি যেমন বলছ বিষয়টি যদি এমন হয়, তাহ'লে তুমি তাদের মুখে ছাই নিক্ষেপ করছ। আর সর্বদা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য সহযোগী থাকবে তুমি যতদিন এ নীতি অবলম্বন করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯২৪)*। তবে জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হ'লে সক্ষম অবস্থায় অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৭, ৫১৩৭)*। অন্যথায় পূর্বোক্ত নীতি অবলম্বন করবে।

প্রশ্ন (১২/১৩২) : আমাদের এলাকায় প্রায় মসজিদের ইমামগণ ছালাত শেষে মুছল্লীদেরকে নিয়ে গোল হয়ে বসেন। বিভিন্ন রকমের দরূদ পড়ে থাকেন। যেমন- বালাগাল উলা, ছাল্লাল্লাহু, ইয়া মুহাম্মাদ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ ইত্যাদি। এসব দরূদ পড়া কি জায়েয।

-কামাল আহমাদ
লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তর : এসব দরূদ সুন্নাত বিরোধী যা পড়লে নেকীর স্থানে গুনাহ হবে। একদা ছাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ আমাদেরকে আপনার উপর ছালাত ও সালাম দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আপনার উপর কিভাবে ছালাত পড়ব? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা বল اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى... আর اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى... *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯১৯)*। অর্থাৎ দরূদে ইবরাহীমী। আর এভাবে গোল হয়ে বসে বিভিন্ন যিকর করার বিরুদ্ধে ইবনু মাস'ঊস (রাঃ)-এর কঠিন ধমকি পূর্ণ হাদীছটি অতি প্রসিদ্ধ *(দারেমী হা/২০৪, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩৩) : জনৈক আলেম বলেন, নূহ (আঃ)-এর প্লাবনের সময় এক বুড়ি তাঁকে বলেছিলেন, প্লাবনের পূর্ব মুহূর্তে আমাকে খবর দিবেন। কিন্তু নূহ (আঃ) তাকে বলতে ভুলে যান। প্লাবনের পর দেখা গেল উক্ত বুড়ী বেঁচে আছেন। এ ঘটনা কি সত্য?

-জসীমুদ্দীন
মহিষকুড়ী, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত ঘটনা মিথ্যা ও বানাওয়াট।

প্রশ্ন (১৪/১৩৪) : কোন্ কোন্ জায়গায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্মিলিত মুনাজাত করেছেন?

-আব্দুল মজীদ
কুবুবিয়া, টাঙ্গাইল।

উত্তর : বৃষ্টির পানি চাওয়ার জন্য ও কুনূতে নাযেলার সময় ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করেছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৫০৮; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন্নবী পৃঃ ১৫৯)*।

প্রশ্ন (১৫/১৩৫) : এনটিভির প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে মাসিক অবস্থায় মেয়েরা মুখস্থ কুরআন তেলাওয়াত করতে পারবে না। তবে দো'আ-দরূদ পড়তে পারবে। উক্ত ফায়ছালা কি সঠিক হয়েছে?

-হাসনা হেনা
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : উক্ত ফায়ছালা সঠিক হয়নি। কারণ ঋতু অবস্থায় ছালাত আদায় করা ও ত্বাওয়াফ করা যায় না *(বুখারী হা/৩০৫-৬)*। ইবনে আব্বাস অপবিত্র ব্যক্তির জন্য কুরআন পাঠ করাকে কোন দোষের কাজ মনে করতেন না। নবী করীম (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকির করতেন *(বুখারী 'ঋতু' অধ্যায়, 'ঋতুবতী নারী ত্বাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের যাবতীয় বিধান পালন করবে' অনুচ্ছেদ-৭)*। অতএব স্পর্শ না করে জুনূবী অবস্থায় মুখস্থ কুরআন পড়তে পারবে।

উল্লেখ্য যে, ঋতুবতী এবং জুনূবী কুরআন পড়তে পারে না মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মুনকার ও বাতিল *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৬১)*।

প্রশ্ন (১৬/১৩৬) : বিড়ি, সিগারেট, জর্দা, গুল, হিরোইন হারাম বস্তু। এগুলো খেলে ছালাত কবুল হবে কি?

- শাকিল আহমাদ
তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : এগুলো মাদকের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম বস্তু। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার বেশীতে মাদকতা আনে, তার অল্পটাও হারাম' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫ 'দণ্ডবিধি' অধ্যায় 'মদ্যপান' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, পবিত্র বস্তু তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করা হয়েছে *(আ'রাফ ১৫৭)*। 'আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ভিন্ন কবুল করেন না' *(মুসলিম মিশকাত হা/২৭৬০ 'হালাল উপার্জন' অনুচ্ছেদ)*। অতএব এসব অপবিত্র বস্তু খেলে তওবা না করা পর্যন্ত কিভাবে ছালাত কবুল হবে?

প্রশ্ন (১৭/১৩৭) : সূরা তওবার ৭৫ ও ৭৬ নং আয়াতদ্বয় কোন্ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে?

-আরাফাত
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : অনুবাদ : 'আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ্র নিকট ওয়াদা করে যে, আল্লাহ যদি আমাদের উপর অনুগ্রহ করেন, তবে আমরা দান-খয়রাত করব ও নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(তওবা*

৭৫)। 'অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে অনুগ্রহ করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগলো এবং তারা হঠকারিতার সাথে বিমুখতা অবলম্বন করল' *(তওবা ৭৬)*।

উক্ত আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে বলা হয় যে, ছা'লাবা (রাঃ)-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে। ইবনু কাছীর (রহঃ) উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন কোন রূপ মন্তব্য ছাড়াই। প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত ঘটনা সঠিক নয়। ইমাম কুরতুবীসহ অন্যান্য বহু মুফাসসির এই ঘটনা সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন *(তাফসীরে কুরতুবী ৮/২১১ পৃঃ, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ; আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬০৭)*।

তাছাড়া ঐ নামে দু'জন ব্যক্তি ছিলেন। একজন বদরী ছাহাবী, যিনি ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর নামে উক্ত কৃপণতা ও রাসূলের অবাধ্যতার ঘটনা ডাহা মিথ্যা ও বানোয়াট ছাড়া কিছুই নয়। অন্যজনের নামে হ'লে সেটার সূত্র অত্যন্ত যঈফ। যদিও ইবনু জারীর ও ইবনু কাছীর স্ব স্ব তাফসীরে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন' *(তাফসীর ইবনু কাছীর, উক্ত আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (১৮/১৩৮) : আমার বন্ধু একজন সরকারী কর্মচারী। সরকারী নির্দেশমতে তাকে মন্দির ও মাযারে ব্লিচিং পাউডার ছড়াতে হয়। শিরকের কেন্দ্রে এসব কাজ করতে তার ঈমানে বাধা দেয়। কিন্তু বাধ্য হয়ে করেন। এজন্য তিনি গোনাহগার হবেন কি?

-এস. কে. মুহাম্মাদ মনছূর আলী
মেটিয়াবুরুজ, কলিকাতা।

উত্তর : পাপের কাজে সাহায্য করা অবশ্যই পাপ। আল্লাহ বলেন, তোমরা সৎকর্মে ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ২)*। তবে একাজে তার বিবেকে বাধা দেওয়াটা তার ঈমানের পরিচয়। তাকে দ্রুত এ চাকুরী ছেড়ে অন্য কোন নিরাপদ ও হালাল পেশা গ্রহণ করতে হবে। নইলে একসময় তার অন্তরে পাপের অনুভূতিটুকুও নষ্ট হয়ে যাবে। যা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবা ১১৯)*।

প্রশ্ন (১৯/১৩৯) : অধিকাংশ স্বর্ণ ব্যবসায়ী গহনা তৈরির সময় মূল স্বর্ণের সাথে অন্য ধাতু মিশ্রণ করে স্বর্ণের দামে বিক্রি করে। উক্ত ব্যবসা কি বৈধ?

-মীযানুর রহমান
চৌডালা, নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য কেউ এমনটি করলে এই ব্যবসা অবশ্যই হারাম হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) প্রতারণার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫৫)*। পক্ষান্তরে খাদ মিশিয়ে গহনা বানালে এবং সে হিসাবে গিনি সোনার চেয়ে দাম কম নিলে ও ক্রেতাকে সেটা জানিয়ে দিলে সেটা ধোঁকা হবে না।

প্রশ্নঃ (২০/১৪০) : জায়গা সংকুলান না হ'লে একই ঈদগাহে একাধিক জামা'আত করা যাবে কি?

-এনামুল হুদা
সোনাবাড়ীয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : একই ঈদগাহে একাধিক জামা'আত করা যাবে না। জায়গা সংকুলান না হ'লে ঈদের মাঠ বড় করে অথবা অন্য কোন খোলা ময়দানে একই স্থানে ঐক্যবদ্ধভাবে ছালাত আদায় করবে। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম একই মাঠে একাধিক বার ঈদের জামা'আত করেছেন মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এক মাঠে একাধিক জামা'আত হলে নিম্নোক্ত সমস্যাগুলো দেখা দিবে: (১) যারা পরে পড়বে তারা সঠিক সময়ে পড়তে পারবে না। অথচ নবী করীম (ছাঃ) সূর্য উঠার পরপরই ছালাত আদায় করতেন *(ইবনে মাজাহ হা/১৩১৭; আবুদাউদ হা/১০৪০)*। (২) জামা'আত চলাকালীন পরের জামা'আতের আশায় দাঁড়িয়ে থাকবে যা সুন্নাতের বরখেলাফ। (৩) বড় জামা'আতের নেকী হতে বঞ্চিত হবে। (৪) আগে ও পরে পড়া নিয়ে দ্বন্দ্ব হবে। (৫) সুন্নাত অনুযায়ী দীর্ঘ খুৎবা দেওয়ার সুযোগ হবে না।

প্রশ্ন (২১/১৪১) : একই মসজিদে কোন ওয়াক্তে একজন আযান দিল এবং প্রয়োজনে সে বাইরে গেল। এই ফাঁকে আরেকজন এসে পুনরায় আযান দিল। এক্ষণে করণীয় কি?

-আব্দুল্লাহ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : এতে কিছু করণীয় নেই। কারণ সে না জেনে দিয়েছে। উভয়ে নেকী পাবে। তবে মসজিদে কোন এক ছালাতের জন্য একবার আযান হওয়াই সুন্নাত।

প্রশ্ন (২২/১৪২) : সোনার ব্যবসার নাম করে বিভিন্ন জনের নিকট ২২০০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এই শর্তে যে, মাসিক ৪৬০০০ টাকা করে ১০ মাস প্রদান করে ৪৬০০০০/= টাকা লভ্যাংশ সহ মূল টাকা পরিশোধ করা হবে। এই ব্যবসা কি জায়েয ?

-বদীউযযামান
কামালনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : এগুলো ব্যবসার নামে স্পষ্ট সূদী কারবার, যা হারাম *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*। এটা এক প্রকার প্রতারণ, যা রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২০)*।

প্রশ্ন (২৩/১৪৩) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একই পণ্যে দুই ধরনের ব্যবসা নিষেধ করেছেন। এক্ষণে নগদ ও বাকী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্যের কমবেশী করা যাবে কি?

-আবু তাহের
সিলেট।

উত্তর : উক্ত প্রশ্ন সঠিক হয়নি। বরং একই বেচাকেনার মধ্যে দু'টি শর্ত নিষেধ করা হয়েছে *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২৩৪; ছহীহ আবীদাঊদ হা/৩৫০৪)*। ফলে একই পণ্যে নগদে এক মূল্য আর বাকীতে এক মূল্য পৃথক করা থাকলে তাতে কোন সমস্যা নেই। কারণ এরূপ ক্রয়-বিক্রয় একই বেচাকেনার মধ্যে শামিল নয়।

প্রশ্ন (২৪/১৪৪) : মদ খেয়ে ইবাদত করলে ইবাদত কবুল হবে কি?

-আব্দুল হালীম
সিঙ্গাপুর।

উত্তর : মদ পানকারীর চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হবে না। সে যদি এ অবস্থায় মারা যায় তাহলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩৩৭৭)*। তওবা ব্যতীত তার গোনাহ মাফ হবে না *(যুমার ৫৩)*।

প্রশ্ন (২৫/১৪৫) : বারবার তওবা করে বারবার গোনাহে লিপ্ত হলে তওবা কবুল হবে কি?

-আব্দুল হালীম
সিঙ্গাপুর।

উত্তর : বারবার তওবা করেও যদি কেউ একই গুনাহে জড়িত হয় তাহলে মনে করতে হবে যে, তার তওবা শর্ত মাফিক হচ্ছে না। এরপরেও তওবার দরজা আল্লাহ খুলে রেখেছেন। বান্দা যতই গোনাহ করুক অনুতপ্ত হয়ে পুনরায় সেই পাপ করবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তার বান্দার তওবা কবুল করেন তার মৃত্যু লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩৪৩ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায় 'তওবা ও ইস্তিগফার' অনুচ্ছেদ-৪)*। তবে তওবার নামে কেউ প্রতারণা করলে আল্লাহ তার ব্যবস্থা নিবেন। তিনি কিয়ামতের দিন মানুষের হৃদয় ও কর্ম উভয়টির দিকে দৃষ্টি দিবেন *(মুসলিম হা/২৫৬৪; ঐ, মিশকাত হা/৫৩১৪ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় 'রিয়া' অনুচ্ছেদ ৫)*।

প্রশ্ন (২৬/১৪৬) : মাগরিব ছালাতে মাসবূক মুছল্লী ইমামকে তাশাহহুদ অবস্থায় পেলে সে কী করবে? একই ছালাতে দুই বারের বেশী তাশাহহুদ পড়া যাবে কি?

-মাযহারুল ইসলাম
সিঙ্গাপুর।

উত্তর : শুধু মাগরিব নয় যেকোন ছালাতে মাসবূক মুছল্লী ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সে অবস্থায় ছালাতে শরীক হবে এবং যা ছুটে যাবে তা পূর্ণ করবে *(বুখারী হা/ ৬৩৬; মুসলিম হা/৬০২)*। দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে তাশাহহুদ পড়তে হয়। অতএব শেষ তাশাহহুদ পাওয়ার কারণে মাসবূকের তিনটি তাশাহহুদ হয়ে যাবে। এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। বরং সে ছালাতে যোগদানের নেকী পাবে।

প্রশ্ন (২৭/১৪৭) : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হিজরী শতাব্দীর শুরুতে একজন মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন। যিনি দ্বীনের সংস্কার করবেন (আবুদাঊদ)। হাদীছটি কি ছহীহ? বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দিদ কে?

-আবদুল করীম
বড়গাছী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : হাদীছটি ছহীহ *(আবুদাঊদ হা/৪২৯১; ঐ, মিশকাত হা/২৪৭ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)*। বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দিদ কে হবেন বা হয়েছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আল্লাহই ভাল জানেন। তবে বিগত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসাবে শায়খ আলবানীকে ধরা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন (২৮/১৪৮) : কাতারের মাঝখানে পিলার বা দেওয়াল রেখে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুল আযীয
শিকারপুর, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) এতে নিষেধ করেছেন *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১০০২)*। তবে লোক সমাগম বেশী হওয়ার কারণে স্থান সংকুলান না হলে বাধ্য হয়ে দাঁড়ানো যেতে পারে *(ছহীহ তিরমিযী হা/২২৯, সনদ ছহীহ)*। উল্লেখ্য, পিলারের মাঝে কেউ একাকী ছালাত আদায় করলে অথবা ইমাম একা দাঁড়ালে কোন সমস্যা নেই।

প্রশ্ন (২৯/১৪৯) : আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও উলুল আমরের আনুগত্য কর। উলুল আমর বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে? তারা কি একাধিক হবেন?

-আহমাদ
সেনগ্রাম, সিলেট।

উত্তর : এর দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রের ও ইসলামী সংগঠনের মুহাদ্দিছ-আমীর, ফক্বীহ ও মুত্তাক্বী আলেমগণকে বুঝানো হয়েছে। যারা আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর নবীর ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক মানুষকে সৎ পথে চলার আদেশ দেন, তারাই উলুল আমরের অন্তর্ভুক্ত *(তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা নিসা ৫৯ দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৩০/১৫০) : অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে এসে জনৈক বুযর্গ বলেন, 'যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যাবে সে শহীদ হয়ে যাবে, কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে এবং সকাল-সন্ধ্যা তাকে জান্নাতের রিযিক দেওয়া হবে'। উক্ত হাদীছের সনদ সম্পর্কে জানতে চাই।

-আফযাল
কানসাট, চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : বর্ণনাটি জাল *(যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৬৫১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬৬১)*।

প্রশ্ন (৩১/১৫১): জনৈক আলেম বলেন, হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, আহলেহাদীছ বলে কাউকে পরিচয় দেওয়া উচিত নয়; বরং সবাইকে মুসলিম বলে পরিচয় দিতে হবে। উক্ত দাবী কি সঠিক?

-এম. এ, ত্বালহা
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া।

উত্তর : সবাই মুসলিম বলে নিজের পরিচয় দিলে কোন সমস্যা নেই। দাওয়াতী ক্ষেত্রে এটি বেশ কার্যকরী। কিন্তু যেহেতু মাযহাবী পরিচয় দিয়ে বহু বিদ'আতকে সমাজে চালু রাখা হয়েছে। সেহেতু ছহীহ্ হাদীছের অনুসারী হিসাবে 'আহলেহাদীছ' নামটি বৈশিষ্ট্যগত পরিচিতি হিসাবে বলা হয়ে থাকে। কারণ আহলেহাদীছ মুসলিমগণই হচ্ছেন একমাত্র হক্বপন্থী দল। ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি দল হক্বের উপরে দৃঢ় থাকবে মর্মে যে সকল ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(ছহীহ মুসলিম হা/১৯২০' ছহীহ তিরমিযী হা/২২২৯)* সে দল সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণের বক্তব্য হল- তারা হলেন 'আহলুল হাদীছ'।

উক্ত হক্বপন্থী দল কোনটি এর ব্যাখ্যায় ইয়াযীদ ইবনু হারূন বলেন, তারা যদি আহলুল হাদীছগণ না হন তাহলে আমি জানি না তারা কারা। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলও একই কথা বলেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক বলেন, আমার নিকট এ হক্বপন্থী দলটি হচ্ছে আহলুল হাদীছ। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় আলী ইবনুল মাদীনী ও ইমাম বুখারীও একই কথা বলেন' *(দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০-এর ব্যাখ্যা)*। অতএব যারাই ছহীহ দলীল ভিত্তিক নিজেদের সার্বিক জীবন পরিচালনা করে তারাই আহলেহাদীছ। এটি বিদ'আতীদের থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যগত স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় মাত্র। যেমন কুরআনে মুহাজির ও আনছারদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যগত নামে প্রশংসা করা হয়েছে *(তওবা ১০০)*। যদিও তারা উভয় দলই 'মুসলিম' ছিলেন।

প্রশ্ন (৩২/১৫২) : দিগন্ত টেলিভিশনে জনৈক আলেম বলেন, ঈদের তাকবীর ১২ এবং ৬ উভয়ের পক্ষে ছহীহ হাদীছ আছে। সুতরাং যেকোন একটি আদায় করলেই হবে? উক্ত কথা কি সঠিক?

-সফিউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : ছয় শব্দটি উল্লেখ করে ছহীহ, যঈফ ও জাল সনদে রাসূল (ছাঃ) থেকে একটি হাদীছও দুনিয়ার কোন আলেমের পক্ষে দেখানো সম্ভব নয়। যেহেতু রাসূল (ছাঃ) হ'তে বারো তাকবীরের ছহীহ হাদীছ রয়েছে, সেহেতু তার বিপরীতে কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়' *(ছহীহ আবু দাঊদ হা/১১৪৯; ছহীহ তিরমিযী হা/৫৩৬)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৫৩) : তা'লীমী বৈঠকের নামে কিছু সংখ্যক মহিলা বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে মেয়েদেরকে বলে, পেশাব-পায়খানা করার পর ঢিলা-কুলুখ না নিলে পবিত্র হওয়া যাবে না এবং ছালাতও হবে না? পানি থাকা অবস্থায় কুলুখ নেওয়া যাবে কি?

-সুমাইয়া
গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুলুখ ও পানি একত্রে ব্যবহার করেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি কখনো কেবল পানি ব্যবহার করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৪২, ৩৬০ 'টয়লেটের শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ)*। কখনো বেজোড় সংখ্যক কুলুখ ব্যবহার করেছেন *(বুখারী হা/১৫৫-৫৬ 'ওযূ' অধ্যায় 'কুলুখ' ব্যবহার অনুচ্ছেদ ২০, ২১)*। ওযূ শেষে তিনি কিছু পানি লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দিতেন *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৬১, ৩৬৬)*। এটি ছিল সন্দেহ দূর করার জন্য। এর চেয়ে বেশী কিছু করা বাড়াবাড়ি মাত্র।

উল্লেখ্য, ঢিলা ব্যবহার করার পর পানি নেওয়ার যে বর্ণনা প্রচলিত আছে তা ভিত্তিহীন *(ইরওয়াউল গালীল হা/৪২; সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৩১)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৫৪) : সূরা ফাতিহা পড়ার পর কয়টি আয়াত পড়তে হবে? প্রথম রাক'আতের পর দ্বিতীয় রাক'আতের ক্বিরাআত লম্বা হলে সমস্যা হবে কি?

-আব্দুল হালীম
হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : সূরা ফাতিহার পর নির্দিষ্ট করে কত আয়াত পড়তে হবে তা কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তবে রাসূল (ছাঃ) যতটুকু সম্ভব ততটুকু পড়তে নির্দেশ দান করেছেন

(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৮৫৬, সনদ ছহীহ)। তাই কখনও ছোট আবার কখনও বড় সূরা তেলাওয়াত করা যাবে। রাসূল (ছাঃ) প্রথম রাক'আত দ্বিতীয় রাক'আতের চেয়ে বেশী দীর্ঘ করতেন মর্মে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী হা/৭৫৯, ৭৭৬, ৭৭৯; মুসলিম হা/৪৫১)*। অতএব সর্বদা এরূপই হওয়া সুন্নাত। তবে কখনো দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআত লম্বা হয়ে গেলে তাতে কোন সমস্যা হবে না *(ছিফাতু ছালাতিন্নবী ১০৩)*।

প্রশ্ন (৩৫/১৫৫) : সূরা বাক্বারাহ ১১৯ নং আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমীনুল ইসলাম
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : 'আমি আপনাকে সুসংবাদ দানকারী এবং সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছি এবং আপনি জাহান্নামীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না *(বাক্বারাহ ১১৯)*। অর্থাৎ সুসংবাদ প্রদান এবং সাবধান করার পরে তারা যে কুফরী করেছে এবং তারা যে জাহান্নামী হয়েছে, এ জন্য আপনাকে ধরা হবে না।

উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতে 'লা-তুসআলু' শব্দটিকে কেউ কেউ 'লা-তাসআলু' পড়েছেন। অর্থাৎ আপনি জাহান্নামীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। অর্থাৎ আপনার সাবধান করার পরে তারা যে কুফরী করেছে, আর সে কারণেই তারা জাহান্নামী। অতএব তাদের অবস্থা সম্পর্কে আপনার জানার প্রয়োজন নেই *(তাফসীর কুরতুবী)*।

উল্লেখ্য, রাসূল (ছাঃ)-এর পিতা-মাতার সাথে সম্পৃক্ত করে উক্ত আয়াতের যে শানে নুযূল প্রচলিত আছে তা সঠিক নয় *(তাফসীর বাগাবী, তাহকীক্বঃ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ আন্ নাম্র। দ্রঃ উক্ত আয়াতের টীকা)*।

প্রশ্ন (৩৬/১৫৬) : ঈদগাহের সামনে কবর থাকলে তাতে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আযহারুল ইসলাম
গড়েরডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ঈদগাহের সামনে দিয়ে যদি প্রাচীর থাকে অথবা কবর যদি দূরে পৃথক জমিতে থাকে, তাহ'লে ছালাত হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কবরের উপর বসো না এবং কবরের দিকে ছালাত আদায় কর না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৮)*।

প্রশ্ন (৩৭/১৫৭) : অনেকের মোবাইলে গান-বাজনা ও অশ্লীল ছবি থাকে। এসব মোবাইল সাথে নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মাহফূয
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : মোবাইলে গান-বাজনা রাখা ও তা শ্রবণ করা হারাম *(লোকমান ৬)*। ইসলাম প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অশ্লীলতাকে হারাম করেছে *(আ'রাফ ৩৩)*। সুতরাং এগুলো থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। তবে এসব সেট বন্ধ রেখে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (৩৮/১৫৮) : 'আল্লাহুম্মা হাস্সানতা খালক্বী ফাআহসিন খুলুক্বী' আয়না দেখার এই দো'আর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছকে কোন কোন লেখক যঈফ বলেছেন এবং ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে। এর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাকছূদুর রহমান
গোছা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছের সনদ ছহীহ *(আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫০৯৯; ইরওয়াউল গালীল হা/৭৪)*। উল্লেখ্য, উক্ত দো'আর শেষে 'ওয়া হার্রিম ওয়াজহী আলান না-র' বলে যে অতিরিক্ত অংশ প্রচলিত আছে সেই অংশটুকু যঈফ *(দ্রঃ ইরওয়া হা/৭৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৩)*।

প্রশ্ন (৩৯/১৫৯) : আমরা জানি আল্লাহ নিরাকার? কিন্তু জনৈক ভাই বলেন আল্লাহর আকার রয়েছে। একথা কি সত্য? তাঁর আকার কেমন?

-আব্দুস সাত্তার
উডল্যান্ড, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : উক্ত ভাইয়ের কথাই সঠিক। আল্লাহ্র নিজস্ব আকার রয়েছে। তবে তাঁর আকার কারো সাথে তুলনীয় নয় *(শূরা ১১)*। আল্লাহ্র চেহারা, হাত, চোখ, পা ইত্যাদি অঙ্গের কথা সরাসরি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে *(রহমান ২৭; মায়েদাহ ৬৪; ত্বোয়া-হা ২০; ক্বলম ৪২)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা *(শূরা ১১)*।

প্রশ্ন (৪০/১৬০) : জনৈক আলেম বলেন, যে ব্যক্তি সফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল সে শহীদ হয়ে মারা গেল। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-আব্দুর রাযযাক
তুলাগাঁও, কুমিল্লা।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৬১৩; যঈফ আত-তারগীব হা/১৮২৫)*।